Registration No.: SO197407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

চতুর্দশ বর্ষ❖সংখ্যা - ৩❖সেপ্টেম্বর ২০২৪

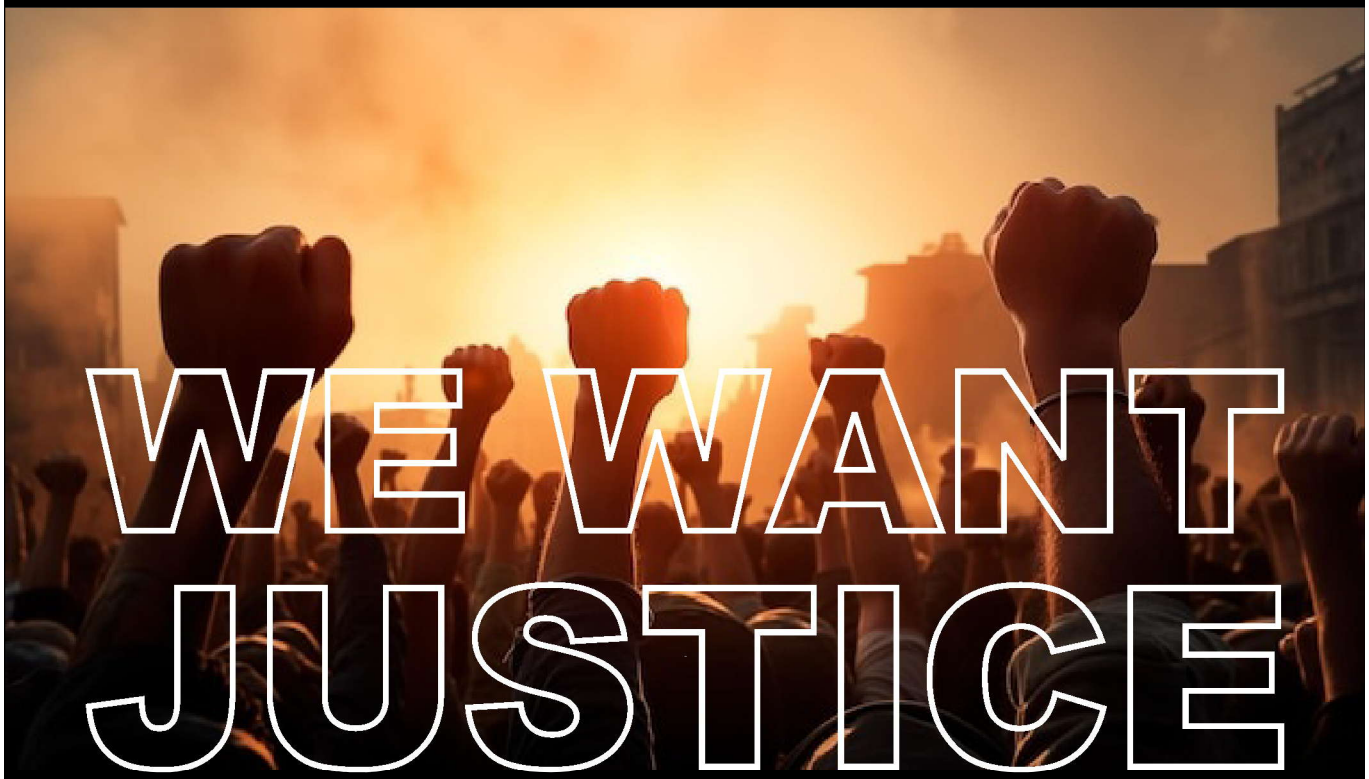

সম্পাদকীয় ঃ **অনির্বাপিত ক্ষোভের আগুন জ্বলছেই ...**

বিশেষ রচনা ঃ কেরালার ওয়েনাডে আবার ভয়াবহ ভূমিধ্বস

বিশেষ খবর ঃ বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে ডঃ নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকারের শিক্ষা

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ পারমাণবিক শক্তি কি মানব সভ্যতা বিকাশের অন্তরায়?

বিজ্ঞান ও কুসংস্কার ঃ শরীর – আত্মা বা শক্তি দিয়ে নয়, পদার্থ দিয়ে তৈরি

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিশেষ রচনা ঃ ৪
◆কেরালার ওয়েনাডে আবার ভয়াবহ ভূমিধ্বস
◆... ডঃ নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকারের শিক্ষা

◈ বিজ্ঞান ও কুসংস্কার ঃ ৮
◆শরীর আত্মা বা শক্তি দিয়ে নয়, পদার্থ দিয়ে তৈরি

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ১২
◆পারমাণবিক শক্তি কি মানব সভ্যতা বিকাশের অন্তরায়?

◈ পাঠকের কলাম ঃ ২১
◆জনগণের মিছিল

◈ বিজ্ঞানের খবর ২২

◈ বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ ২৪
◆পরিবেশ বান্ধব বিকল্প অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ জল অন্ত্যেষ্টি বা ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস

◈ প্রশ্ন ও উত্তর ঃ ২৬
◆তামার পাত্রে জল পান করা বা খাবার খাওয়া কতটা স্বাস্থ্যসম্মত?

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ২৭
◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ৩০
◆শ্রমজীবী মানুষের জীবন মানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষা!

◈ গল্পচ্ছলে বিজ্ঞান চর্চা ঃ ৩৩
◆আলাপচারিতায় আইনস্টাইন ও তাঁর আবিষ্কার

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৭

◈ কবিতা ঃ ৩৯
◆যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
◆এই সময়

সম্পাদকীয় ঃ

অনির্বাপিত ক্ষোভের আগুন জ্বলছেই ...

কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষন ও খুনের ঘটনা মানব সভ্যতার তথাকথিত অহংকারকে ভুলুণ্ঠিত ক'রে প্রকৃত কদর্য অন্তর্বস্তুকে প্রকাশ করে দিয়েছে। এই ঘটনা অতীতে ও ইদানীংকালে দেশে-বিদেশে ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলা সমস্ত নারী নির্যাতনের মধ্যে নৃশংসতায় প্রথম সারিতে স্থান পাবে। সরকারী হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ঐ মহিলা চিকিৎসককে দলবদ্ধভাবে শুধু যে ধর্ষন ও খুন করা হয় এমন নয়, ঘটনার পর অপরাধের সমস্ত প্রমাণ লোপাট করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ শুরু করা হয়েছে এ অভিযোগ সর্বত্র। নির্যাতিতার মা-বাবা ও পরিবার পুলিশ ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম থেকেই পরিবারের কাছে তথ্য গোপন করা হয়েছে, চরম বিভ্রান্ত ও হেনস্থা করা হয়েছে, অতি দ্রুততার সাথে মৃতদেহ সৎকার করা হয়েছে, মা-বাবাকে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে এমনকি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার ও ছাত্রছাত্রীরা ঘটনার পরদিন থেকেই নিরপেক্ষ তদন্ত ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক চরম শাস্তির দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের অভিযোগ অপরাধীদের আড়াল করতে ও তদন্ত বিপথগামী করতে প্রশাসন নিজের দায়িত্বে ঘটনাস্থল পরিবর্তন করে নিজেদের মতো চিত্রনাট্য রচনা করছে।

ঘটনার পরদিন পুলিশ একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে তড়িঘড়ি গ্রেফতার করে। ঐ ব্যক্তিকে পুলিশ একমাত্র অপরাধী হিসাবে হাজির করলেও নির্যাতিতার মৃতদেহের প্রকাশিত বিবরণ দলবদ্ধ অপরাধীদের উপস্থিতি স্পষ্ট করেছে।। রাজ্য প্রশাসনের সর্বময় কর্ত্রী পুলিশকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে অপরাধীকে ফাঁসীতে লটকানোর নিদান দিয়ে দেয়। সমস্ত ঘটনাপ্রবাহে পুলিশ ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের (যে দুই মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে আছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং) ভূমিকা জনমানসে গভীর সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়। হাসপাতালের অধ্যক্ষকে কলকাতা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। উপরন্তু অধ্যক্ষ পদত্যাগ করলে স্বাস্থ্য প্রশাসন কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষপদে স্থলাভিষিক্ত করার আদেশনামা প্রকাশ

করে। সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া ও চিকিৎসকরা সংগঠিতভাবে সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে ও অধ্যক্ষের ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়ে কাজে যোগদান রদ করতে সমর্থ হয়।

এই ঘটনার জের রাতারাতি রাজ্য থেকে সারা দেশে এমনকি দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের প্রতিবাদের এমন অভূতপূর্ব অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ দ্রুত গণবিক্ষোভের চেহারা নেয়। অপরাধীর বিচার ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা চেয়ে শাসকের বিরুদ্ধে এই রকম জনরোষ ইতিহাস ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা জানা নেই। শহর-নগর-গ্রাম-গঞ্জে আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে ফিরছে একটাই স্বর – 'জাস্টিস ফর আর জি কর'। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে ঐ একই স্বর – জাস্টিস ফর আর জি কর। অন্যায়কে মুখ বুজে মেনে নিয়ে গুমরে থাকা অতি সাধারণ মানুষগুলো আজ মিছিলে সরব। মিছিল এখন আর মানুষ খুঁজে বেড়ায় না বরং মানুষ মিছিল খুঁজে বেড়াচ্ছে। শাসকের চোখে চোখ রেখে মানুষ বলছে – 'শাসক তোমার কিসের ভয়? ধর্ষক তোমার কে হয়?' চলমান এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই অমূল্য প্রশ্নের উত্তর সমাজের ব্যাপক মানুষের কাছে ক্রমশঃ পরিষ্কার হচ্ছে। এই জনবিক্ষোভ জনমানসে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ।

পরবর্তী ঘটনাক্রম বলছে শুধু ঐ হাসপাতালে নয়, রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালগুলি হল দুর্নীতিবাজদের মুক্ত চারণভূমি। সরকারী অর্থ তছরুপ, হাসপাতাল বর্জ্য নিয়ে মাফিয়ারাজ, ভেজাল ওষুধের কারবার, রোগী পরিষেবার নামে অর্থ সংগ্রহ, ডাক্তারী পড়ুয়াদের ফেল করিয়ে দিয়ে পয়সার বিনিময়ে পাশ করানো, ফেল করা অযোগ্য পড়ুয়াদের পয়সার বিনিময়ে নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে অযোগ্য ডাক্তার তৈরী করা ইত্যাদি সবই হাসপাতালে কর্মরতদের কাছে গোপন বিষয় নয়। কে না জানে, পোষা গুন্ডাবাহিনী ও প্রশাসনের সমস্ত স্তরকে ব্যবহার করেই সব রকমের দুর্নীতি সংগঠিত করা হয়। তবুও যা প্রকাশ্যে এসেছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এটাও জানা আছে বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটাই হল সমস্ত রকম সামাজিক অপরাধের আঁতুড়ঘর, দুর্নীতি হল যার অলংকার।

এ রাজ্যে বিরাটি-বানতলা, কামদুনি ও অন্যান্য রাজ্যে কাঠুয়া-হাথরাস-উন্নাও-নির্ভয়ার মতো শত শত ঘটনার পর আর জি করের ঘটনা সমাজে নারীদের স্থান কোথায় তা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সমাজ মাধ্যম, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনে নগ্ন নারী শরীর প্রদর্শন লাগাতারভাবে নারীর সম্ভ্রমকে ভূলুণ্ঠিত করে চলেছে। মোবাইল ফোনে নগ্নতার সহজলভ্যতা যুব সমাজকে বিপথগামী ও অপরাধপ্রবন করে তুলবে তাতে আর আশ্চর্য কি? যে ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে পণ্য করে তুলেছে তার শিকড় প্রোথিত রয়েছে এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে। তাই নারী-নির্যাতন হল এই ব্যবস্থার একটি অবশ্যম্ভাবী ফসল। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে প্রতি ১৭ মিনিটে একটি করে নারী নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়। এই সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলা নারী নির্যাতনের মাত্র ১০ শতাংশ। নারী নির্যাতনের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা যদি বিত্তশালী বা প্রভাবশালী হয় তাহলে সাজা কম হয়। দীর্ঘ কারাবাসে দন্ডিত হলেও প্যারোলে মুক্ত জীবন যাপন করে। অপরাধী দরিদ্র হলে সাজা দীর্ঘ হয় অথবা ফাঁসী হয়। সমাজের বিত্তশালী অপরাধীকে আড়াল করার জন্য নিরপরাধ বিত্তহীনকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ফাঁসীতে লটকানোর ঘটনাও বিরল নয়।

চলমান আন্দোলন পুরুষতন্ত্রের বিপরীতে নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নারীবাদী তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করেছে। ১৪ই অগাস্ট ডাকা নারীদের 'রাত দখল' এর কর্মসূচী অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। কেবল শহরে নয়, রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম গঞ্জে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ঐ রাতে মানুষ রাস্তায় নেমে 'তিলোত্তমা'র বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিছিল সমাবেশ সংগঠিত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাদেরই অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের অব্যক্ত ক্ষোভ স্লোগানে পর্যবসিত হচ্ছে। প্রতিটি রাত দখলের কর্মসূচীতে পৃথিবীর দুটি অর্দ্ধেক আকাশ একাকার হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপক মানুষ রাস্তায় নেমে যখন প্রতিবাদে সামিল হয়, শাসক চিন্তিত হয় ও আন্দোলনকে বিপথগামী করার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিভিন্ন রঙয়ের সংসদীয় দলগুলি কখনো স্বনামে আবার কখনো বেনামে তাদের নিজ নিজ স্বার্থে লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হচ্ছে ও আন্দোলনের রাশ সংসদীয় গণ্ডীর ভিতর বেঁধে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস রেখে চলেছে। শাসক দলের প্রতিনিধিরাও বিচারের দাবি করছে আবার রাস্তায় নেমে যে মানুষগুলো বিচার চাইছে তাদের প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে, শারীরিক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাতে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সামিল না হতে পারে সেই মর্মে শিক্ষা দপ্তর নির্দেশ জারি করেছে, কিন্তু, সেই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে পড়ুয়ারা

●*শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

বিশেষ রচনা ঃ

কেরালার ওয়েনাডে আবার ভয়াবহ ভূমিধ্বস

গত ২৯শে জুলাই ২০২৪ মধ্যরাতে (ইংরাজি তারিখ অনুসারে ৩০শে জুলাই রাত ২টা থেকে ভোর ৪.৩০-এর মধ্যে) একের পর এক লাগাতার ভূমিধ্বসে দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের ওয়েনাড জেলার ভাইথিরি তালুকের চুরালমারা, পুঞ্জিরিমাট্টম, মুন্ডাকাই, আট্টামালা, মেপ্পাডি এবং কুনহোম গ্রামে ভূমিধ্বসে সরকারি মতে ৪৪২ জনের (বেসরকারি মতে সহস্রাধিক), ৩৯৭ জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সরকারি মতে ১২৯ জন মৃত্যু হয় (বেসরকারি মতে পাঁচ শতাধিক) নিখোঁজ হন। এই ভয়াবহ ভূমিধ্বসে সরকারি মতে অন্তত ১০ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন এবং প্রায় ১২০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ১,৫৯২ জন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভূমিধ্বসের কেন্দ্র মুন্ডাক্কাই গ্রামে একটি সেতু ধ্বংস হওয়ায় উদ্ধারকার্য কার্যত করাই যায় নি। প্রবল জলের স্রোতের সঙ্গে কাদা এবং বোল্ডারের আঘাতে শত শত কাঁচা ঘর, একটি মসজিদ, একটি পোস্ট অফিস, একটি রিসর্ট এবং অসংখ্য পাকা বাড়ি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে।

ওয়েনাড, বিপর্যয়ের পর

ভূমিধ্বসের সূত্রপাত হয় পুঞ্জিরিমাট্টম গ্রামের উপরে অবস্থিত মুন্ডাক্কাই অঞ্চলে। ইসরোর স্যাটেলাইট তথ্য থেকে জানা যায় যে ধ্বসের সূত্রপাত হয়েছে সমুদ্রতল থেকে ১৫৫০ মিটার উপরে এবং ধ্বস হয় প্রায় ৮৬০০০ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে যা ১২টি পূর্ণাঙ্গ ফুটবল মাঠের সমান। ধ্বসের পর বোল্ডার, বালি, কাদা জলের সঙ্গে প্রায় ৮ কি.মি দূর পর্যন্ত গেছে ইরুভানিফুজা নদী বরাবর। যাওয়ার সময় অসংখ্য জায়গায় নদীর বাঁকের পরিবর্তন হয়ে অসংখ্য জায়গায় নদীর পাড় এবং নদীপাড়ের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। [তথ্যসূত্র ঃ www.the hindu.com – ১৬/০৮/২০২৪ – ওয়েনাড ল্যান্ডস্লাইড ...]

সতর্কীকরণ ছিল কি?

ওয়েনাডে গত ২২শে জুন থেকে লাগাতার বৃষ্টি হয়। ২৯শে জুলাই ঘটনা ঘটার আগের ৪৮ ঘন্টায় বৃষ্টিপাত হয় ৫৭২ মি মি। প্রথম ২৪ ঘন্টায় ৩৭২ মি.মি এবং পরে ২৪ ঘন্টায় ২০০ মি.মি। এই বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় ৫ গুণ বেশি।

এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা কি চুপ করে বসেছিলেন? সরকারের কাছে দুর্যোগ নিয়ে কি কোন সতর্কবার্তা ছিল না? তথ্য বলছে অবশ্যই ছিল। 'হিউম সেন্টার ফর ইকোলজি এন্ড ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজি' সংস্থা জেলা প্রশাসনকে একদিন আগেই সতর্কবার্তায় জানিয়েছিল। সংস্থার ডিরেক্টর সি কে বিষ্ণুদাস জানিয়েছিলেন "বিভিন্ন কারণে ওয়েনাডে ১লা জুন থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০০ মি মি ছাড়িয়ে গেছে। জলধারক সকল বস্তু জল দ্বারা সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত। জলাধারগুলি ভর্তি হয়ে আছে। আর কোন ভারি বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি এমন ঘটবে যে বিরাট মাপের ভূমিধ্বস ঘটবে।" [তথ্যসূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ০১/০৮/২০২৪] ঘটনার পর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাংবাদিককে শ্রী বিষ্ণুদাস বলেন যে উদ্যোগ নিলে চুরমালা স্কুল এবং উপরে অবস্থিত গ্রামগুলি থেকে মানুষকে অবশ্যই সরিয়ে নেওয়া যেত এবং এতো মৃত্যু ও এতো নিখোঁজের ঘটনা ঘটত না। [সূত্র ঃ ঐ]

এই অঞ্চলে ভূমিধ্বস কি প্রথম ঘটল?

ভারত সরকারের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থা মিলে দিল্লী আইআইটি থেকে 'ইন্ডিয়া ল্যান্ডস্লাইড সাসেপটেবল ম্যাপ' [আইএলএসএম] বা ভারতের ধ্বসপ্রবণ অঞ্চলের ম্যাপ প্রকাশ করে। এই ম্যাপে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া কেরল রাজ্যই ভূমিধ্বসের জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক। এই মানচিত্র অনুসারে কেরালার ৩৩০০

বর্গ কি.মি অঞ্চল ভয়ানক ধ্বসপ্রবণ এবং ২৮৮৬ বর্গ কি.মি অঞ্চল মাঝারি মাপের ভূমিধ্বস প্রবণ। কেরালার ওয়েনাড জেলার অধিকাংশই ভয়াবহ ধ্বসপ্রবণ ও মাঝারি ধ্বসপ্রবণ বলে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত ছিল। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি অবধি ভারতে মোট ৩৭২২টি ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২২৩৯ টিই (অর্থাৎ প্রায় ৬০ শতাংশ) ভূমিধ্বস ঘটেছে কেরালা রাজ্যে। [সূত্র ঃ জিএসআই, 'ওয়েনাড ল্যান্ডস্লাইড : হাউ টু ভিলেজেস ভ্যানিসড ওভারনাইট, দ্য হিন্দু, ১৬/০৮/২০২৪]

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের অগাস্টে এই ওয়েনাড জেলাতে ঘটা ভয়াবহ ভূমিধ্বস ও তজ্জনিত প্লাবনে পাঁচ শতাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল।

সুতরাং এই ঘটনা কোন নতুন ঘটনা নয়, তা ঘটে চলেছে লাগাতার সতর্কীকরণ সত্ত্বেও।

ওয়েনাডের ভূতাত্ত্বিক ঘঠন ঃ দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের ওয়েনাড জেলা ভূতাত্ত্বিকভাবে পশ্চিম ধারওয়ার ক্রেটন এবং তার মধ্যকার পেনিনসুলার নাইস এবং ওয়েনাড সিস্ট বেল্ট দ্বারা গঠিত। এই প্রস্তরগুলি অতি প্রাচীন আর্কিয়ান যুগের এবং ভূতাত্ত্বিকভাবে হিমালয় পর্বতমালার মত অস্থিতিশীল নয়। এখানকার প্রস্তরগুলি প্রধানতঃ অতি প্রাচীন রূপান্তরিত শিলা সিস্ট ও নাইস পাথর দ্বারা গঠিত এবং ওই শিলাস্তরগুলি পূর্ব-পশ্চিম থেকে পূর্ব দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম উত্তর পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত। প্রস্তরগুলির শিলাস্তর অত্যন্ত খাড়া (প্রায় ভূমির সঙ্গে লম্বাভাবে অবস্থিত) এবং শিলাস্তরে অসংখ্য চ্যুতিতল (ফল্ট) বা জয়েন্ট প্লেন ইত্যাদি লিনিয়ামেন্ট দেখা যায়। ইন্ডিয়ান প্লেটের সঙ্গে তিব্বতীয় প্লেটের সংঘর্ষের সময় এই লিনিয়ামেন্টগুলির সক্রিয়তা দেখা যায় অল্প মাত্রায়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলগুলি অত্যধিক খাড়া, ভূমির ঢাল ৫০ শতাংশ অঞ্চলে ২০ ডিগ্রির বেশি। প্রাচীন এই শিলাস্তরে কোটি কোটি বছর আবহবিকারের ফলে উপরি অংশে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে এবং তা ঝুরঝুরে। প্রাকৃতিক কারণে এখানে বৃষ্টিপাত অত্যধিক বেশি। মৃত্তিকা, প্রস্তরের মধ্যকার ফাটলগুলি (ফোলিয়েশন প্লেন, ফল্ট প্লেন বা জয়েন্ট প্লেন) ওই জলের একাংশ ধারণ করে। ধারাবাহিক ও ভারি মাত্রায় বৃষ্টিপাত যখন প্রস্তরের জলধারণ ক্ষমতার সীমা ছাড়ায় তখন জলের চাপে ভূমিধ্বস ঘটে থাকে।

কেরালার ওয়েনাড জেলা গোল্ড স্টিয়াটাইট (সোনা সমৃদ্ধ নরম পাথর) এবং মলিবডেনাইট (মলিবডেনামের আকরিক) নামক অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পাহাড়ে এবং উপত্যকায় এই সম্পদ উদ্ধারে নানা খননকার্য চলে।

বারংবার ভূমিধ্বস কেন?

পরিবেশবাদী সংগঠনগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রচার করছে যে মনুষ্যজনিত কারণে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বর্তমানে পূর্বের তুলনায় ১০ শতাংশের অধিক বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এটাই সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ ভূমিধ্বসের প্রধান কারণ (তথ্যসূত্র ঃ ইন্ডিয়া টু ডে, ১৪/০৮/২০২৪)।

কিন্তু ভূবিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই প্রচার খন্ডন করে বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, কেরালা বিশ্ববিদ্যারয়ের ভূবিজ্ঞানী এবং কেরালা রাজ্য ভূমিধ্বস অ্যাডভাইসরি কমিটির পরিবেশ বিজ্ঞানীদের একটি টীম সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের অন্য কথা বলেছেন, "Wayanad Tragedy : Land slides natural ... can't prevent them but impact can be minimised." অর্থাৎ ওয়েনাড বিপর্যয় ঃ ভূমিধ্বস প্রাকৃতিক ... একে বন্ধ করা যাবে না কিন্তু প্রভাব কমানো যেতে পারে" [এক্সপ্রেস নিউজ সার্ভিস, ৪ঠা অগাস্ট, ২০২৪ এ প্রকাশিত]।

এই সাক্ষাৎকারে উক্ত বিজ্ঞানীরা বলেন ওয়েনাড অঞ্চলে ভূমিধ্বস ঘটে প্রাকৃতিক কারণে। একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, ক্ষতিকারক প্রভাব কমানো যেতে পারে মাত্র। উক্ত সাক্ষাৎকারে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রী আমবিলি মন্তব্য করেন ঃ "ভূতাত্ত্বিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে ভূমিধ্বসের মুখ্য নিয়ন্ত্রক জলবায়ু। অন্যান্য কারণগুলি হল ভূমির ঢাল বা নতি (Slope), মাটির চরিত্র, পাথরের গঠন ইত্যাদি। যখন কোন ভূতাত্ত্বিক (টেকটনিক) পরিবর্তন হয় তখন সকল কারণ (factor) গুলি পুনরায় সক্রিয় হয়। পাথরের মধ্যকার জল সাধারণভাবে ঝর্ণা বা জলধারার আকারে বেড়িয়ে যায়। কিন্তু যখন বৃষ্টি হয় ভারিমাত্রায় এবং ধারাবাহিকভাবে তখন পাথরের স্তরগুলির পক্ষে সেই জল ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যখন এটা প্রান্তিক সীমা ছাড়িয়ে যায় তা ফেটে পড়ে বিপর্যয় ঘটায়।

উক্ত সাক্ষাৎকারে শ্রী আমবিলি বলেন "মানুষের ভূমিকা এই ভূমিধ্বসের কারণ নয়। উচ্চ ভূমিঢাল অঞ্চলে কোন পাথরের স্তরই বেশি জলধারণ করতে পারে না। এছাড়া ঐ ধরনের উচ্চ ভূমিঢাল সমৃদ্ধ অঞ্চলে খনিজ উত্তোলনের জন্য খননকার্য ভূমিধ্বস প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় (মনে রাখা দরকার যে ওয়েনাড জেলা সহ সমগ্র কেরালায় বিপুল খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ, বিশেষ করে অতিমূল্যবান সোনা ও মলিবডেনাম – সমীক্ষণ)। আমরা কোন অঞ্চলের ভূতত্ত্ব নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ ছাড়াই খাদান গড়ে তুলছি। খাদানে ব্লাস্টিং এর জন্য বহু গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয় প্রস্তরের মধ্যে। এটা ধ্বস প্রবণতা বাড়ায়।"

শ্রী আমবিলি আরও বলেন "অবৈজ্ঞানিক বৃক্ষরোপণ ভূমিধ্বস প্রবণতা বাড়ায়। বৃক্ষরোপণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করতে হবে। প্রস্তর এবং মাটির প্রকৃতি বিবেচনা করে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। আমরা যদি পাহাড়ের জলধারা বা ঝর্ণার গতিপথে (first order stream) বাধা সৃষ্টি করি তবে জল নিচের দিকে চাপ বাড়াবে এবং ছোট ভূমিধ্বস সৃষ্টি হবে। এরাটুপেট্টা অঞ্চলের ভূমিধ্বস মানুষের কার্যকলাপের ফলে হয়েছে। আমরা ত্রিশূর অঞ্চলে দেখেছি যে ছোট নদীগুলিকে আটকে রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনাগুলি ভূমিধ্বস প্রবণতা বাড়ায়।

একজাতীয় বৃক্ষরোপণ (monocrop plantation) জৈব বৈচিত্র কমিয়ে ভূমিধ্বস প্রবণতা বাড়ায়। পর্যটনের নামে যা ঘটছে তা ভূমিধ্বস প্রবণতা বাড়াচ্ছে। এই প্রাকৃতিক জৈব বৈচিত্র মাটিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে, একজাতীয় বৃক্ষরোপণ তা নষ্ট করে দেয়।

মাটির নিচের পাথরের ফাটলকে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয় লিনিয়ামেন্ট (যথা ফল্ট লাইন, জয়েন্ট লাইন ইত্যাদি) দ্বারা। বিপর্যয় ঘটে সর্বোচ্চ লিনিয়ামেন্ট অঞ্চলে। মানুষের ভূমিকা এই বিপর্যয় বাড়ায়।

কোন অঞ্চলে ভূমির ঢাল (Slope) ২০°র বেশি হলে ভূমিধ্বস ঘটে। কেরালার ৫০ শতাংশ অঞ্চলের চরিত্র এই প্রকার। যখন আমরা পাহাড়ের মাথায় বহুতল বাড়ি গড়ে তুলি তখন তার ভারে মাটি ও প্রস্তরে চাপবৃদ্ধি হয় এবং ভূমিধ্বস ঘটে। একইভাবে যখন ভূমিঢালের শেষাংশ কাটা হয় বাড়ি এবং নালা তৈরির জন্য তখন ভূমিধ্বস প্রবণতা বেড়ে যায়।"

যাই হোক কেরালাসহ ভারতের মোট আয়তনের প্রায় ৪.৭৫ শতাংশ অঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে বড় ও মাঝারি ধরনের ভূমিধ্বস প্রবণ প্রাকৃতিকভাবে। সমগ্র হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল – জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিঙ-কালিম্পং, সিকিম, অসম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল, ত্রিপুরা, মিজোরাম ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের কেরালা প্রাকৃতিকভাবে ভূমিধ্বস প্রবণ। বিজ্ঞানীরা বার বার সতর্ক করছেন যে এইসকল অঞ্চলে রাস্তা, ব্রীজ, রেললাইন, শহর-নগরের বিস্তার, বিল্ডিং গড়ে তোলা, মুনাফার জন্য একজাতীয় বৃক্ষরোপণ, খনিজ উত্তোলনের জন্য খননকার্য ইত্যাদি হয় সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে করতে হবে, নতুবা করা যাবে না। এটা জানা সত্ত্বেও সরকার-প্রশাসন-পৌর সংস্থাগুলি ঐসব নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের কাজ করে চলেছে। ফলে প্রতিনিয়ত ভূমিধ্বস জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনছে। শত শত মানুষের জীবনহানি ঘটছে প্রতিবছর, কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। মুনাফা এবং দ্রুত অতিমুনাফার তাড়নায় বর্তমান সমাজের তথা রাষ্ট্রের মালিক ও পরিচালকরা এতে কর্ণপাতও করছে না। বিপর্যয়ের পর ত্রাণের নামে জনগণের অর্থ লুঠ হচ্ছে, পুনর্গঠনের জন্য নতুন বরাদ্দ কে পাবে তার প্রতিযোগিতা চলছে। প্রকৃতি ও মানুষের কথা ভাবা এই অসাম্য ও বৈষম্যের সমাজে হয় না।

পরিবেশবাদী সংগঠনগুলি এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন আন্দোলন গড়ে তুলছে না। বিচ্ছিন্নভাবে কোন ইস্যুতে হৈ চৈ করছে মাত্র। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে তাই জনগণকে সচেতন করে সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের লক্ষ্যে পথে নামতে হবে।■

●*সম্পাদকীয় শেষাংশ* ... অনির্বাপিত ক্ষোভের আগুন জ্বলছেই ...

স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও পড়ুয়াদের সাথে নিয়ে দলে দলে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। মহিলা সুরক্ষা দিতে একদিকে নিত্য নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করা হচ্ছে, বিল পাশ করা হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে, সিসি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়া হচ্ছে সর্বত্র। নারী সুরক্ষার নামে মেয়েদের রাতে ডিউটি বন্ধ করার চরম পিতৃতান্ত্রিক নিদান মহিলারা এবং প্রগতিশীল সমস্ত মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে তদন্ত প্রক্রিয়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার জন্য মরীয়া প্রয়াস রাখা হচ্ছে। 'ন্যায় বিচার চাই' এই দাবিতে পথে নামা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠছে যে আদালত কি এমন নারকীয় হত্যাকান্ডের অপরাধীদের এবং তার উৎসটাকে নির্মূল করতে আদৌ তৎপর? নাকি আন্দোলনরত ডাক্তারদের আন্দোলনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্থিতাবস্থা জারি রাখতে বেশি উৎসুক? অন্যদিকে রাজ্য সরকার কোর্টে নিজেদের সদিচ্ছা প্রমাণের উদ্দেশ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের ৫ দফা দাবির মধ্যে কয়েকজন প্রশাসককে বদলী করে বিক্ষোভের আগুন নেভাতে মরিয়া প্রয়াস নিয়েছে। সবাই সব দেখছে সব শুনছে সব বুঝছে, শুধু বিচার থেকে যাচ্ছে অধরা। এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে ন্যায় বিচার পাওয়ার আশা যে আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় এ ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। আন্দোলনকারী ডাক্তারী পড়ুয়ারা সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে এই লড়াই বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই উত্তাল আন্দোলন যেমন অনেক বৃহত্তর প্রশ্ন তুলে ধরেছে তেমনি জনসমস্যা সমাধান ও ন্যায় বিচার অর্জনের নতুন পথের দরজাও উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষা এটাই।■

বিশেষ রচনা ঃ

বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে ডঃ নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকারের শিক্ষা

– তন্ময়

'জেবদা পুরাবা, তেবদা বিশ্বাস" বিজ্ঞানমনস্কতার অর্থ বোঝাতে ডঃ নরেন্দ্র দাভোলকার মারাঠি ভাষায় গভীর অর্থবহ এই চারটি শব্দ ব্যবহার করতেন। বাংলা তর্জমায় যা হল "ততটুকুই গ্রহণীয় যতটুকুর সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।"

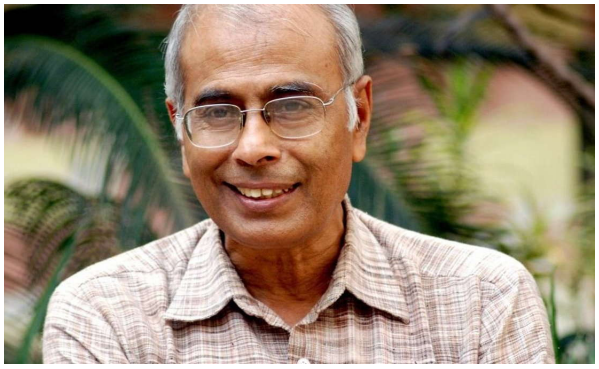

মানবজাতির সার্বিক বিকাশের স্বার্থে প্রকৃতি ও সমাজের প্রতিটি ঘটনার পেছনে কার্যকারণ সম্পর্ক সন্ধান ও বিশ্লেষণ অতি প্রয়োজনীয়। অনবরত প্রশ্ন করার আর প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা থেকে জন্ম নেয় বিজ্ঞানের মনন। তবে শুধুমাত্র বিজ্ঞানমনস্কতার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মানসিকতাকে সাথী করে পরিবার থেকে সমাজকে বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস জারি রাখতে হবে। অদম্য সাহসের সাথে বিজ্ঞানসচেতন সমাজ গড়ে তোলার এই কঠিন কাজ সুচারুভাবে করে চলেছিলেন পেশায় চিকিৎসক ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকার।

কুপ্রথা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পশ্চাদপদতা থেকে মানুষের মুক্তির জন্য গড়ে তুলেছিলেন মহারাষ্ট্র অনিস অর্থাৎ মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি। ধীরে ধীরে সারা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সংগঠনের দুই শতাধিক শাখা। নিজের জীবনবৃত্তে আপাদমস্তক কুসংস্কারহীন লড়াকু সৈনিক সমাজজীবনেও চালিয়ে গিয়েছিলেন আপোষহীন সংগ্রাম।

সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার তাগিদে লাগাতার বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার, জ্যোতিষী ও সাধুবাবাদের ভন্ডামি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেওয়ার পাশাপাশি জাতপাত, ধর্মান্ধতা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। তবে শুধুমাত্র কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে সাধ্যমতো পাশে ছিলেন। তিনি জানতেন মানুষের জীবনে যতদিন অনিশ্চয়তা থাকবে ততদিন এই সমাজ থেকে কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর সরানো সম্ভব হবে না। দলিতদের সমানাধিকার, প্রতিটি গ্রামে একটা করে পানীয় জলের কুপ, জল দূষণ রোধ, প্রান্তিক মানুষদের মদ্যপানের আসক্তি দূরীকরণ, সশক্তিকরণ ও আত্মমর্যাদা জাগ্রত করা ইত্যাদি বহুবিধ কর্মসূচীর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।

বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের অন্যতম অগ্রণী সৈনিকের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা। সেইজন্য তাঁর নেতৃত্বে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তেরি হয় কুসংস্কার ও যাদুটোনা বিরোধী আইনের খসড়া। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় এই আইন প্রণয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিলটি সাতবার বিধানসভায় পেশ করা হলেও তাঁর জীবনকালে মৌলবাদী শক্তির চাপে বিলের ওপর আলোচনা চালিয়ে তা পাশ করানো হয় নি।

মহারাষ্ট্র অনিসের আন্দোলনে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল বহু মানুষ। ভয় পেয়েছিল শোষক শ্রেণী। নরেন্দ্র দাভোলকারের 'উদয়ন পন্ডিত' হয়ে ওঠা, ব্রেইন ওয়াশের যন্তরমন্তর গুড়িয়ে দিয়ে মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলার প্রক্রিয়ায় নড়েচড়ে বসেছিল রাষ্ট্র যন্ত্র। তাই ভয় দেখানো হয়েছল ওনাকে। বক্তব্যের কণ্ঠরোধ, ম্যাগাজিন বিক্রি না করার ফতোয়া থেকে শুরু করে প্রাণনাশের হুমকি সহ একাধিক বাধার প্রাচীর তোলা হয়েছিল যুক্তিবাদী আন্দোলনের সামনে। কিন্তু অকুতোভয় মানুষটি রাষ্ট্রের দেওয়া পুলিশি নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্রের চোখে চোখ রেখে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরির আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।

বেশিদিন সহ্য হয়নি মৌলবাদীদের। ২০১৩ সালের ২০শে অগাস্ট মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ডাঃ

●শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়

বিজ্ঞান ও কুসংস্কার ঃ

শরীর আত্মা বা শক্তি দিয়ে নয়, পদার্থ দিয়ে তৈরি

– পঞ্চানন মণ্ডল

ক'দিন আগে একটি আধ্যাত্মিক বই পড়েছিলাম। তাতে একজায়গায় লেখা আছে *'ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এরা আধ্যাত্মিক মানুষ। এদের শরীরে ছিল আধ্যাত্ম শক্তি'!* আবার স্বামী বিবেকানন্দ আত্মা সম্পর্কে বলেছেন, *'আত্মাই সকল চিন্তার উর্ধ্বে, জন্ম-মৃত্যুবিহীন, যাকে তলোয়ার বিদ্ধ করতে পারে না অথবা আগুন পোড়াতে পারে না, বায়ু শুকাতে পারে না অথবা জল গলাতে পারে না, আদি-অন্তবিহীন, নিশ্চল, অজ্ঞেয়, সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু সত্ত্বা, যা না দেহ, না মন বরং এ সবকিছুর উর্ধ্বে।* অনেকে বলে মৃত্যুর পর দেহের শক্তি আত্মাতে পরিণত হয়। আত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়! অনেক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা মানুষজনও কিন্তু এই আত্মায় বিশ্বাস করেন। আত্মা কি প্রশ্ন করলে অনেকেই বলেন – প্রাণশক্তি। শক্তি ও ভরের নিত্যতা সূত্রের সাথে মিলিয়ে বলেন – আত্মা একপ্রকার শক্তি মানে প্রাণশক্তি – একে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না কেবল রূপান্তর সম্ভব। তাই জন্মান্তর আছে, সে নতুন দেহ ধারণ করে!

সত্যি কি তাই?

আত্মার ধারণা

আত্মার ধারণা অনেক পুরোনো। তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে এই আত্মার ধারণা এসেছিল নিয়ানডার্থালদের যুগে, তা প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ানার্থালদের আগে পিথেনকানথ্রোপাস বা সিনানথ্রোপাস যুগে আত্মা বা ধর্মাচারণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। নিয়ানডার্থালদের যুগের আত্মার ধারণা সমাজ পরিবর্তনের হাত ধরে পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের আত্মার ধারণার সাথে নিয়ানডার্থাল যুগের আত্মার কোন মিল নেই। সাধারণভাবে অনেকের ধারণা প্রাণের মধ্যেই রয়েছে এই আত্মা নামক ব্যাপারটি। মানে যতক্ষণ কারও শরীরে আত্মা থাকে ততক্ষণ সে জীবিত, মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায় কিংবা বলা যেতে পারে আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে গেলেই মানে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হলেই মৃত্যু হয়। যদিও মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী বা জীবজগতের কোন কিছুর মধ্যে আত্মা আছে তা স্বীকার করা হত না। আত্মা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মত আছে। আছে হরেকরকমের গল্প। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করে আমরা একটু সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলেই বুঝতে পারব এই আত্মার অসারতা। বিভিন্ন ধর্মমতে আত্মা নিয়ে বিভিন্নতা থাকলেও মূল সুরটি এক। তা হল, এই আত্মাই হল আমাদের জীবনের মূল যোগসূত্র। যার দ্বারা আমরা পরিচালিত। এখানে একটা কথা বলা দরকার ধর্মীয় মতে সারা জগৎ পরিচালিত হচ্ছে এক সর্বশক্তিমান দ্বারা। যাকে বলা হচ্ছে পরামাত্মা। এই পরমাত্মা দ্বারা আবার পরিচালিত হচ্ছে আমাদের আত্মা। গীতার একটি শ্লোকে বলা হয়েছে

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'

যার অর্থ হল, 'আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অমর। বদলায় শুধু দেহ। আত্মার কখনও জন্ম হয় না এবং আত্মার মৃত্যুও নেই। আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তি সাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা জন্ম-রহিত। আত্মা নিত্য। আত্মা সনাতন। আত্মা পুরাতন। শরীরের মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ কিনা মানুষ যেমন জামা বদল করে, আত্মা বদল করে দেহ। বলা হয়েছে আত্মা চিরকালীন এবং সর্বদা একরূপে স্থায়ী। দেহনাশে এর বিনাশ হয় না।' তার মানে আত্মা অজেয়, অমর, অক্ষয়, মুক্ত!

আত্মার অস্তিত্ব যখন প্রশ্নের মুখে –

এখন প্রশ্ন, এই মুক্ত আত্মা কোথায় থাকে, কোন ঘুসুড়িরামের গোডাউনে! যে জন্ম নিচ্ছে সে তো তার দেহে আত্মার প্রবেশের ফলেই সে প্রাণ পাচ্ছে, সেই আত্মা আসছে কোথা থেকে? আবার মৃত্যুর পর যখন দেহ ছেড়ে আত্মা চলে যাচ্ছে। সেই ছেড়ে যাওয়া আত্মাই বা যাচ্ছে কোথায়?

আমরা সকলেই জানি যে স্ত্রী ও পুরুষের যৌনমিলনের পর একটি ডিম্বাণু ও একটি শুক্রাণুর নিষেকের ফলে একটি প্রাথমিক কোষ বা জাইগোট সৃষ্টি হয়। তারপর সেই কোষ বিভাজন, বৃদ্ধি ও বিকাশের মাধ্যমে মাতৃগর্ভে ফিটাসে পরিণত হয়। সেই ফিটাস সদ্যজাত শিশু হিসাবে ভূমিষ্ঠ হয়। আমার সহজ সরল প্রশ্ন এখানেই। এই দেহে আত্মার প্রবেশ কখন হয়? জননকোষের মিলনের সময় নাকি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়?

অনেকে বলেন নতুন দেহ ধারন করল আত্মা, এটাই তো শক্তির রূপান্তরকে সমর্থন করল?

এটাই যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে আত্মা একই কাজ করছে, একই রূপে থাকছে – কেবল আলাদা দেহে – রূপান্তর কোথায় হল?

কেউ মারা যাওয়ার পর আত্মা তার দেহ থেকে নির্গত হয়ে যাওয়ার পর তা কিসে রূপান্তর হল? আবার সেখান থেকে পুনরায় আত্মা হয়ে নতুন শরীরে কখন প্রবেশ করল?

নতুন দেহ ধারণ করল আত্মা এটাকি সত্যিই শক্তির রূপান্তরকে সমর্থন করল?

আত্মা থাকলে কারো মৃত্যুর পর অর্থাৎ আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর পুরো দেহই মৃত। কোন অঙ্গই আর জীবিত থাকত না। তাহলে চোখ, কিডনি, লিভার, অস্তিমজ্জা ইত্যাদি অঙ্গদান ও রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করে তাকে সুস্থ করা সম্ভবপর হত না।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, আত্মার পুনর্জন্ম হয় আর মুসলিমরা বিশ্বাস করে আত্মা তিনদিন পর কবর থেকে উঠে জাহান্নাম বা জান্নাতে যায়। তাহলে কী আত্মার সরণ ঘটে?

এও বলা হয় আত্মা এমন এক শক্তি যার উপর আমাদের নাকি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু অনেক গল্পে দেখবেন অনেকে ইচ্ছামৃত্যু লাভ করেছে। তার মানে তার কন্ট্রোলে আত্মা! তাহলে বুঝতে পারছেন আত্মা বলে কিছু নেই।

আমাদের শরীর কী দিয়ে তৈরি –

এবার দেখি আমাদের প্রাণ ও শরীর নিয়ে, বিজ্ঞান কী বলে। **বিজ্ঞান বলছে মানুষ শক্তি দিয়ে তৈরী নয়, মানুষের শরীর পদার্থ দিয়ে তৈরী। বিজ্ঞানের ভাষায় কার্য করার সামর্থ্য হল শক্তি।** তাই মৃত্যুর পর মানুষের শরীরের শক্তি কোথাও যাওয়ার প্রশ্ন অযৌক্তিক। বিজ্ঞান উন্নত ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বানিয়েছে, ইসিজি, ইইই, ইউএসজি বানিয়েছে। তাছাড়া শক্তি পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। কোন যন্ত্রে আত্মার অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। বিভিন্ন ধর্মে আত্মা জন্মান্তর ইত্যাদি মানুষের মাথায় গেঁথে দেবার জন্য মানুষের দেহ শক্তি দিয়ে তৈরি এসব আজগুবি কথা বলা হচ্ছে। আত্মা বলে এক অলীক জিনিসকে শক্তি বলে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য 'শক্তির নিত্যতা' সূত্র, কোয়ান্টাম এইসব কিছু শব্দ ব্যবহার করে ভুলভাল অপবিজ্ঞান ছড়ানো হচ্ছে।

আমাদের শরীর অন্যান্য সব জীবের মতোই কয়েক ধরনের অণু দিয়ে গঠিত। তারমধ্যে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা, প্রোটিন, লিপিড বা ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ বা ধাতব যৌগ ও জল। এছাড়া রয়েছে প্রাণের অস্তিত্ব ও পূর্ণতার জন্য দুই ধরনের নিউক্লিক এসিড – DNA ও RNA। এতে আছে অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, লোহা, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, মলিবডেনাম, কোবাল্ট ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ।

খনিজ পদার্থ ছাড়া মানুষের দেহে থাকা জৈব অণুগুলোকে ভাঙলে আমরা মৌলিক পদার্থ যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি পাব। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মানুষের শরীরে ৬৫% অক্সিজেন, ১৮% কার্বন, ১০% হাইড্রোজেন, ৩% নাইট্রোজেন, বাকি ৪৮ ফসফরাস, লোহা, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি থাকে। মানুষের শরীরের প্রায় ৭০% জল। এই জল আবার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি; কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ এবং খনিজ পদার্থের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার দ্বারা আমাদের তথা জীবের শরীর গঠিত। যে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো শরীরের মধ্যে ঘটা দরকার তার জন্য এই আন্তঃক্রিয়াই দায়ী।

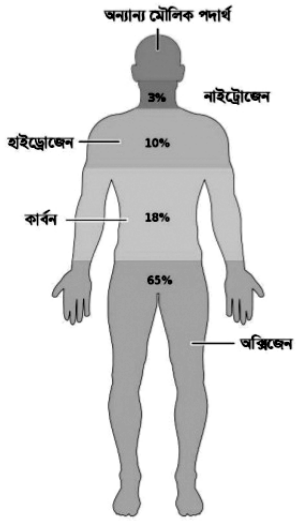

মানব শরীরে শক্তির উৎস

যেকোন আন্তঃক্রিয়া বা রাসায়নিক বিক্রিয়া চালাতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। জীবের শরীরে এই শক্তি ক্রিয়াশীল। আমরা যেসব খাদ্য খাই সেগুলো পরিপাক ও শোষণের পর রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে কোষে কোষে পৌঁছে যায়। কোষের মধ্যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যমধ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তি ও

তাপশক্তিতে রূপান্তিরত হয়। এই শক্তি কখনো ATP বা GTP রূপে জমা থাকে। এই ATP বা GTP ভেঙ্গে শক্তি মুক্ত হয়। এই শক্তি জীবের সকলপ্রকার জৈব রাসায়নিক জৈবনিক প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি। তাছাড়া এই তাপশক্তি আমাদের শরীরকে গরম রাখে। এছাড়া সঞ্চিত শক্তি তাপশক্তি রূপে পরিবেশে আসে। এই শক্তি শুধু জীবের শরীরে নেই। সমগ্র মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে। শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী, বিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুবক। শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়।

প্রাণ কী?

যেকোন জীব তার দেহে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আন্তঃক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন একটা সত্ত্বা। যার প্রাণ আছে, প্রাণের লক্ষণ আছে। জীব হিসাবে তার জীবনের বৈশিষ্ট্য আছে। কোন কোন জীবের আবেগ ও সৃজনশীলতা আছে। জীবনের জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো পরস্পরের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল, এদের একটা সুসংবদ্ধ সমন্বয়ে জীবন প্রবাহমান।

মানুষ বা আরও অন্যান্য বহুকোষী জীবে প্রাণ কোথায় থাকে?

আমরা জানি বিবর্তনের পথে পৃথিবীতে এককোষী জীব প্রথম এসেছিল। এই এককোষী জীবেরাই নিজেদের একত্রিত করে বহুকোষী জীবন তৈরী করেছে। আমাদের শরীর প্রায় ২৫-৩৫ লক্ষ কোটি কোষ দিয়ে তৈরী। এই কোষগুলো আবার টেস্টটিউবে বা কাঁচের পেট্রিডিশে জীবাণুবিহীন পরিবেশে উপযুক্ত কালচার মিডিয়ামে একাই বেঁচে থাকতে সক্ষম! তাহলে মানুষও কী তাহলে একক প্রাণী নয়! তাহলে প্রশ্ন মানুষের আসল প্রাণটা কোথায় থাকে? কোষে কোষে বহু প্রাণ আবার মানুষ হিসেবে একটি প্রাণ!

আবার কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, খুব ঠান্ডায় কোষ বা ডিম্বাণু-শুক্রাণু বছরের পর বছর ওভাম বা স্পার্ম ব্যাঙ্কে ফ্রোজেন করে রেখে পরে ব্যবহার করা যাচ্ছে! তা আবার মানুষের জন্ম দিচ্ছে! তাহলেই ভাবুন জীবন কী! আবার ভাবুন বহুকোষী জীবের কিছু কোষ মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করে বসে, নিজের কাজ ঠিকমতো করতেই চায় না! এরা হলো ক্যান্সার কোষ। একটি গবেষণায় দেখা গেছে মানষের ক্যান্সার কোষ ৭৩ বছর ধরে কালচারে মিডিয়ামে বেঁচে আছে ও বংশবৃদ্ধি করছে। বিভিন্ন ভ্যাকসিন ও অ্যান্টিবডি তৈরীর জন্য শরীরের বাইরে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের কোষের চাষ করা হয়। তাহলে প্রাণ কী সেই ধারণা কী কিছুটা তৈরি হল নাকি ধারণা বদলে গেল?

মৃত্যু আসলে কী?

মৃত্যু নিয়ে আজ আর কোন রহস্য নেই, 'কিছু একটা' বা 'আত্মা' শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নেই। জীববিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞান দিয়েই মৃত্যুর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। জীবদেহের প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলা জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার সমন্বয় বন্ধ হলেই সেই অবস্থা মৃত্যু। কিন্তু তাই বলে একটি জীব মরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার সব কোষ বা সব কলা বা সব অঙ্গ মরে যায় এমন নয়। তা নাহলে মৃত দাতার কিডনি দ্বারা একজন রোগীর প্রাণ বাঁচানো যেত না।

বৃদ্ধ হয়ে বয়সজনিত কারণে স্বাভাবিক মৃত্যু ২৪-৪৮ ঘন্টা এমনকি কয়েকদিন ধরে ঘটে থাকে। একে একে বৃক্ক, যকৃৎ, ফুসফুস কাজ করা বন্ধ করে দেয়। কিডনি কাজ না করার ফলে শরীরে প্রচুর অপ্রয়োজনীয় অ্যাসিড ও বিষাক্ত রেচন পদার্থ জমে যায়। পুষ্টি ও অক্সিজেনের অভাবে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়, মাথায় রক্ত যাওয়া বন্ধ হয়ে সমস্ত স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে মৃত্যু সম্পূর্ণ হয়। তখন মস্তিষ্ক থেকে আর কোন ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল পাওয়া যায় না। দুর্ঘটনার ফলে মাথায় খুব জোরে আঘাত লাগলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হতে পারে, কারণ মস্তিষ্কের শ্বাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নষ্ট হয়ে ফুসফুস ও হৃৎপিন্ড কম সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। যেটা আমরা 'শেষ নিঃশ্বাস' বলি বা 'কোন কিছু বেরিয়ে যাওয়া' ভাবি সেটা আসলে ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যাওয়ার শেষ ও জোরালো প্রচেষ্টা; একটা ফিডব্যাকের ফল। ফুসফুসের সংকোচন-প্রসারণের হার কমে এলেই রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়লে রক্ত আম্লিক হয়ে যায়, ফলে মস্তিষ্ক আরো জোরে শ্বাস নেওয়ার সিগন্যাল পাঠায়, ডায়াফ্রাম জোর খাটিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর চেষ্টা করে।

মৃত্যুর পরিণতি

এখন কোনো মানুষ বা কোনো জীবের মৃত্যুর পর তার শরীর জীবাণুদের আটকাতে পারবে না, এখন যদি শরীর দাহ না করে কোন খোলা জায়গায় ফেলে রেখে দিলে জীবাণু বা বিয়োজক দ্বারা তার শরীরের সব যৌগিক পদার্থকে ভেঙে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাবে, এর ফলে জটিল যৌগগুলি সরল যৌগে পরিণত হবে, যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, ফসফাইড বা গাছপালা জন্মাবে, মানুষের শরীরের যৌগগুলো

গাছের কাজে লাগাবে। কিছু মাছি ও কীটপতঙ্গ মৃতদেহের পচা মাংসে ডিম পাড়বে ও তাদের লার্ভারা মাংস খেয়ে বড় হবে, পূর্ণতা লাভ করবে, ফলে মানুষের শরীরের পদার্থ মাছি ও পতঙ্গদের শরীরে স্থানান্তরিত হবে। এ এক চক্রাকার প্রক্রিয়া। এগুলো সবই জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের অংশ।

মৃত্যুর কারণ কী আত্মা বেরিয়ে যাওয়া!

●জীবের দেহে বার্ধক্য বা সেনেস্যান্টের কারণে বয়ঃপ্রাপ্তির পর তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাজের গতি কমিয়ে দেয়। দেহের বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ার আন্তঃক্রিয়া ও সমন্বয়ে ভাটা পড়ে, ফলে একসময় তার মৃত্যু হয়।

●এছাড়া শরীরে কোনও ভাবে বিষ ঢুকলে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াতে সাহায্যকারী কোনো উৎসেচক কাজে বাধা পড়ে, ফলে পরস্পরের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল জীবনের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ধারাবাহিকভাবে থেকে যায়। জীবের মৃত্যু ঘটে।

●কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোনো কোনো এক বা একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সমন্বয় বন্ধ হয়ে যায় তাহলেও জীবের মৃত্যু ঘটে।

●অথবা, কোনো এক বা একাধিক অঙ্গের কলাকোষে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হলে বা খাবার না পৌঁছালে সেই অঙ্গ বা অঙ্গগুলি খাদ্য ও শক্তির অভাবে কাজ করা বন্ধ করে দিলে জীবের মৃত্যু ঘটে।

●মানুষের মত জটিল বহুকোষী জীবগুলোর জীবন আসলে কোষে কোষে অক্সিজেন ও অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) সরবরাহের অভাবেই থেমে যায়।

অর্থাৎ মৃত্যু কোনো আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়। আগেই বলেছি মৃত্যু হল কোনো জীবের সেই সমস্ত জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপগুলির স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সমাপ্তি, যা কোন জীবে থাকা পদার্থ সমষ্টিকে জীবনের লক্ষণগুলি প্রকাশের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। অর্থাৎ কিনা **মানুষসহ সমস্ত জীবের দেহ শক্তি নয় পদার্থ দিয়ে তৈরি**। মানুষের দেহে কোন আত্মা থাকে আর সেই আত্মা মৃত্যুর পর ছেড়ে চলে যায়, বা অন্য কারোর শরীরে প্রবেশ করে বা পরমাত্মার বিলীন হয় বা স্বর্গে যায় কিংবা প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায়; এমনটা আদৌ সত্যি নয়। অন্তত বিজ্ঞান তা বলে না। ■

গ্রাফিক্স – অলোকনাথ

● *৭ পৃষ্ঠায় শেষাংশ*

বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে ডঃ নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকারের শিক্ষা

নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকারকে। হিন্দুত্ববাদী 'সনাতন প্রভাত' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ঝরে পড়ল উল্লাস। লেখা হল "ওয়ান গেটস হোয়াট ওয়ান ডিজার্ভস"। অর্থাৎ "তার যা পাওনা ছিল সেটাই তিনি পেয়েছেন"।

প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানী থেকে সমাজের সর্বস্তরের অসংখ্য প্রগতিশীল মানুষ। তবু বিচার পাননি ডাক্তারবাবু। বিচার পাননি প্রতিবাদী জনতা। প্রায় এক যুগ ধরে চলা মামলার শেষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল পেশায় কৃষক শরদ কালাসকর এবং পেশায় একটা প্রাইভেট দোকানের হিসাবরক্ষক সচিন আন্দুরের। তথ্যপ্রমাণের অভাবের কারণ দেখিয়ে বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন দাভোলকারকে হত্যার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী রূপে চিহ্নিত প্রভাবশালী বীরেন্দ্র তাওড়ে, আইনজীবী সঞ্জীব পুনালেকর এবং বিক্রম ভাবে সহ তিনজন। পুলিশি তদন্ত, আইনি প্রক্রিয়া, বিচারের রায় এই শোষণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রভাবশালীদের কব্জায় থাকলেও মানুষের বিচারে এই আইনি বিচার প্রহসনের নামান্তর।

হিন্দুত্ববাদী শক্তি হয়তো জানেনা একজন ব্যক্তিকে খুন করা যায় কিন্তু তাঁর চিন্তাধারাকে নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হয়তো সাময়িক জয় হতে পারে কিন্তু প্রগতিশীল শক্তির লড়াই বহমান। জয় তাদের হবেই। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অল ইন্ডিয়া সায়েন্স নেটওয়ার্ক এবং মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকার যেদিন শহীদ হয়েছিলেন সেই ২০শে অগাস্ট দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবস রূপে চিহ্নিত করে। আজ সারা ভারতের যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান সংগঠনগুলো এই দিনে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোরন তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছে।

বর্তমান সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জনমানসে প্রসারের মতো বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচার ও প্রসারও চরম প্রতিকূল। পাঠ্যক্রম থেকে বিবর্তনবাদ, পর্যায় সারণির মতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো বাদ দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো অপবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি সেই ইঙ্গিত বহন করে। এই চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে মানুষের পাশে থেকে, মানুষকে সাথে নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পথে নতুন সমাজ গড়ে তোলা ডঃ নরেন্দ্র দাভোলকারের শিক্ষা। সেই শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমরা সেই দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। ■

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

পারমাণবিক শক্তি কি মানব সভ্যতা বিকাশের অন্তরায়?

মানবসভ্যতার সূচনা এবং তার অগ্রগতি শক্তির ব্যবহার ব্যতীত সম্ভব ছিল না। বর্তমান পৃথিবীতে প্রকৃতির সমস্ত শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্য (হেডিয়ান যুগে অর্থাৎ আজ থেকে ৩৮০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী নিজেই নিজের তাপের উৎস ছিল)। মানুষসহ সমস্ত জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ প্রকৃতি হতে খাদ্যের মাধ্যমে সরাসরি শক্তি সংগ্রহ করে ও জীবন ধারণ করে। তবে একমাত্র মানুষই কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। এই ক্ষমতাই মানুষকে পৃথিবীর অধীশ্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আগুনের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতিতে খাদ্য সংগ্রহ করেছে কোন প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই। সমস্ত বলশালী জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই মানুষ সংগ্রহ করেছে তার খাদ্য। তার বেঁচে থাকার রসদ। মানুষ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে একে অপরের খাদ্য হিসাবে দীর্ঘ জঙ্গল-জীবন যাপনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার আত্মরক্ষার প্রযুক্তি আবিষ্কার করে। আবিষ্কার করে শিকারের কৌশল পদ্ধতি। অস্ত্রের আবিষ্কার ব্যতীত যা ছিল অসম্ভব। এইভাবে দীর্ঘ জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রেই মানুষ অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারকে বহু-যোজন পিছনে ফেলে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটাতে থাকে। আগুনের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার সভ্যতার এই অগ্রগতিতে উল্লম্ফন ঘটায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ইত্যাদির মধ্যে আগুনের বিধ্বংসী ও ভয়াল রূপ দেখেছিল আদিম মানুষ। যে আগুনের কাছে অতীতে সে নিজেকে নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পন করেছিল। সেই আগুনকে সে পোষ মানাতে শিখল। শিখল আগুনের সংরক্ষণ। আর এইভাবেই দিন ও রাতের পার্থক্য ক্রমশঃ সংকুচিত হল। এইভাবে মানুষ অন্ধকারকে জয় করল। আগুন অর্থাৎ তাপশক্তি মানব সমাজকে নবরূপে সজ্জিত করল। তার ব্যবহারের সমস্ত সামগ্রীকে আগুনের সংস্পর্শে এনে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করল। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করার মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তেই সে গবেষণার হাতেখড়ি দিয়ে বসল। এতদিন সে যে কাঁচা মাংস গ্রহণ করে এসেছে খাদ্য হিসাবে, সেটাকেও আগুনে ঝলসে নিয়ে দেখেছে তা আরও সুস্বাদু ও সুপাচ্য। শুরু হল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। এইভাবে সে তার খাদ্যাভ্যাসটাকে বদলে ফেলল যা পক্ষান্তরে তার মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটালো। আগুনের আবিষ্কারের পর ধাতুবিদ্যারও সূচনা হল। ভূত্বকের উপরিতলে নদীর অববাহিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ধাতুর (মূলতঃ তামার) আকরিককে আগুনে গলিয়ে একদিন আকস্মিকভাবেই তা থেকে ধাতু বার করে আনল মানুষ। এতদিন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে পাথর ব্যবহার করা হত। ধাতুর আবিষ্কারের পর পাথরের ব্যবহার ধীরে ধীরে পিছু হঠতে লাগল আর ধাতু তার স্থান দখল করল। প্রস্তর যুগকে পিছনে ফেলে মানুষ ধাতুযুগে প্রবেশ করল। প্রথমে তাম্রযুগ ও পরে ব্রোঞ্জ (সংকর ধাতু) যুগের আবির্ভাব মানুষের ধাতুবিদ্যার বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। ধাতু যুগে মানুষের সমাজ জীবন অনেক সুসংহত হল। কৃষি কাজ, পশুপালন, ইমারতি কার্য ইত্যাদি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, বিভিন্ন ব্যবহারিক সামগ্রীর সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি পেল, আর এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছিল তাপশক্তি তথা আগুনের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে।

কিন্তু এই বিকাশ সমাজের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে হয় নি। কোথাও এর বিকাশ হয়েছে অনেক বেশি, কোথাও কম। সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়ায় একদল মানুষের হাতে রয়ে গেল সামাজিক উৎপাদনের চাবিকাঠি – তারা পরিণত হল শাসক বা শোষকশ্রেণী হিসাবে। অন্যদিকে সমাজের অবশিষ্ট আপামর মানুষ রয়ে গেল তাদের পদানত হয়ে - শাসিত বা শোষিত শ্রেণী হিসাবে। সমাজ প্রগতির হাত ধরে বিভিন্ন সময়ে, উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। আদিম মানবসভ্যতা ব্যতীত আজ পর্যন্ত কায়েম হওয়া সকল সমাজব্যবস্থাই হল শ্রেণীভিত্তিক।

আদিম সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ তাপশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আরম্ভ হলেও পরবর্তীকালে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এবং আরও পরে বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে মানুষ অন্যান্য শক্তিকেও ব্যবহার করেছে। এমনকি এক শক্তিকে অন্যশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে ও সামাজিক উৎপাদনে তা প্রয়োগ করেছে। প্রাকৃতিক যান্ত্রিক শক্তি যেমন বায়ুপ্রবাহ, নদীর জলপ্রবাহ, সমুদ্রের জোয়ার ভাটার শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগিয়েছে। লিভারের ব্যবহার করেছে ও তা হতে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করার নিয়ম আবিষ্কার করেছে। বায়ুর গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ 'উইন্ড মিল' বানিয়েছে ও পেষাই কাজে তা ব্যবহার করেছে। জলপ্রবাহে নিহিত গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘুরিয়েছে, পরবর্তীতে তা

জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কার, তার উৎপাদন ও অন্য শক্তিতে রূপান্তরের বিজ্ঞান সামাজিক উৎপাদন তথা সমাজজীবনে যে কেবল অকল্পনীয় পরিবর্তনই এনেছে এমন নয়। মানুষের জ্ঞানের পরিসীমা গ্রহ-গ্রহান্তর ছাড়িয়ে অসীমে ধাবিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ হয়েই চলেছে।

তাপশক্তি হতে যান্ত্রিকশক্তির রূপান্তরের বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নির্মিত বাষ্পইঞ্জিন সমাজের উৎপাদনকে ধারণাতীত বিকশিত করে। তাপশক্তি হতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন অর্থাৎ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন জ্বালানী যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানী দহনের ফলে উদ্ভুত তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে প্রচুর পরিমান তাপবিদ্যুৎ তৈরী করা হয়ে থাকে। এছাড়াও পারমাণবিক শক্তিকেও বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। বর্তমান দুনিয়ায় মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির সিংহভাগ দখল করে আছে তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ। শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বিভিন্নপ্রকার শক্তি সহ সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত উপায় উপকরণের মালিক হল শাসক গোষ্ঠী। বর্তমান দুনিয়াতে সমস্ত সামাজিক উৎপাদন মানাফার লক্ষ্যেই চালিত হয় তাই সমস্ত উৎপাদিত পণ্যের মত বিদ্যুৎশক্তিও একটি পণ্য এবং তা ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য। এই অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী কোন সামগ্রীই মানুষের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে উৎপাদিত হয় না বরং চাহিদা-যোগানের নিয়ম মেনেই মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদিত হয়। ফলে দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে আর সমাজের পরিচালক গোষ্ঠীর হাতে সঞ্চিত হচ্ছে প্রচুর সম্পদ। ফলস্বরূপ উৎপাদন ব্যবস্থার সংকট তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে ও যুযুধান দুই গোষ্ঠী শাসক গোষ্ঠী ও শাসিতগোষ্ঠীকে মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিপুল বিকাশ, শক্তির প্রয়োগ উৎপাদন ব্যবস্থার যে বিকাশ ঘটিয়েছে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ তা ধারণ করতে পারছে না। বাজারের লক্ষ্যে পরিচালিত এই উৎপাদন ব্যবস্থা তাই ভুগছে 'অতি উৎপাদনের সংকটে', এই কারণে শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী, উৎপাদনের বিকাশ পরিবেশের পরিপন্থী এই মত তুলে ধরে জনমানসে প্রচার করছে। শাসকশ্রেণীর সৃষ্ট ও মদতপুষ্ট এন জি ও-রা পরিবেশের সংরক্ষণের নামে কোথাও জলবিদ্যুৎ, কোথাও তাপবিদ্যুৎ আবার কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবীতে সোচ্চার হচ্ছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি নদীর স্বাভাবিক গতিপথ নষ্ট করে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে বলা হচ্ছে। পরমাণু বিদ্যুৎপ্রকল্পের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে-এই শক্তি উৎপাদনের ফলে কর্মরত মানুষ, বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের লাগাতার ক্ষতি হচ্ছে, পরমাণু বর্জ্য বোমা তৈরীর মসলা তৈরী করছে এবং তার নিষ্ক্রমণ সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী বিপদ ডেকে এনেছে।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ তথা স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পর আধুনিক পুঁজিবাদের সূচনাকাল থেকে মানুষ প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে নিজের করায়ত্ব করে চলেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবেশের পরিবর্তনের পাশাপাশি মানব সভ্যতাও কিছুমাত্রায় পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলেছে। বিজ্ঞানী তথা বিজ্ঞান মনস্ক জনতা এই দিকটিকে উপেক্ষা করে না। বৈজ্ঞানিকভাবে ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার প্রয়াসও চলেছে। কিন্তু সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে তার লক্ষ্য মানবকল্যাণ নয়, মুনাফা আরও মুনাফা। এর ফলে প্রকৃতিকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা তারা নেয় না। বিশ্ব জুড়ে সমাজ সচেতন মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, আরও সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাপশক্তি বা পারমাণবিক শক্তি সহ নানাবিধ উৎপাদনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে বলে তা বন্ধ করার দাবি কি প্রগতিশীল?

পারমাণবিক শক্তি নিয়ে ভীতির কারণ

মানব সভ্যতায় সাধারণ মানুষের কাছে "পারমাণবিক শক্তি"র আত্মপ্রকাশ যেভাবে ঘটেছে তা বিভীষিকাময়, দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ঘন্টা যে এতটাই দীর্ঘস্থায়ী বিষাদময় হবে তা বিশ্ববাসীর বেশিরভাগের ধারণার বাইরে ছিল। ১৯৪৫ এর ৬ই আগস্ট হিরোশিমায় "লিটিল বয়" এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে "ফ্যাট ম্যান"– পরমাণু বোমা-দুটি তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে কয়েক লক্ষ মানুষ ও দুটি শহরের বেশীরভাগ সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণের বহুদিন পরও তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব মানুষ সহ জীবজগতের উপর বিষময় প্রভাব জারী রেখেছে। পারমাণবিক শক্তির প্রথম প্রয়োগের উদাহরণ স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের কাছে "পারমাণবিক শক্তি" সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার জন্য যথেষ্ট। পরবর্তীতে "তিনমাইল" দ্বীপ, "চেরনোবিল" ও ২০১১ খ্রিস্টাব্দে 'ফুকুসিমা-দাইচির" দুর্ঘটনা এবং ভারত সহ বিভিন্ন দেশে পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের নিরাপত্তার অভাব ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্ক্রমণের অবৈজ্ঞানিক ক্ষতিকারক পদ্ধতিকে উল্লেখ করে অনেকেই

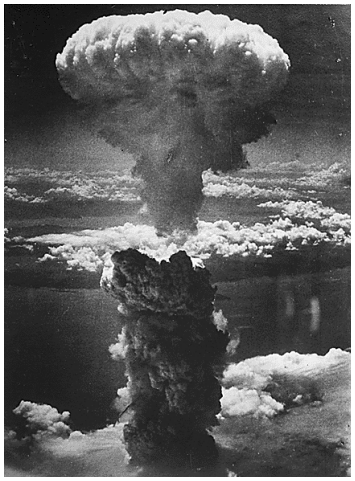

"পারমাণবিক শক্তি" উৎপাদনের বিরোধিতা করে আসছেন বলা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তির কাঁচামাল উত্তোলন, শক্তি উৎপাদন, বর্জ্য নিষ্ক্রমণ সবই মানুষ সহ জীবজগতের পক্ষে বিপজ্জনক। পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতির মালমশলার জোগান হয় এর থেকেই। তাই পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা ও তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। অন্য একটি বক্তব্য হল পারমাণবিক শক্তি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলতে পারে তবে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। তাই প্রশ্ন ওঠে তবে কি বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার মানব জীবনে কল্যাণের বদলে ধ্বংসের বীজ পুঁতে ছিল? এই নিয়ে তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে সংশয় বিরাজ করছে। এই সংশয় কাটিয়ে সঠিক ধারণায় পৌঁছবার লক্ষ্যেই এই রচনা।

পারমাণবিক শক্তি কি?

এই বিষয়টা বোঝার জন্য আমাদের জানা দরকার পারমাণবিক শক্তি কি? কিভাবে তা উৎপন্ন হয় ? জানা দরকার এই শক্তি পরমাণু বোমায় কিভাবে কাজ করে আর পারমাণবিক চুল্লিতে কিভাবে কাজ করে? জানা দরকার এই শক্তি মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যায় বা হয় কিনা ? জানা দরকার এই শক্তির আত্মপ্রকাশ এত ভয়াবহ ছিল কেন ?

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মোট ভর তার উপাদান নিউক্লিয়নগুলির ভরের যোগফলের চেয়ে সামান্য কম হয় – ভরের এই পার্থক্যকে **ভর-হ্রাস (Mass defect)** বলা হয়। আবার কোন নিউক্লিয়াসের মধ্যে বদ্ধ নিউক্লিয়নগুলির মোটশক্তি, নিউক্লিয়াসের বাইরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিউক্লিয়নগুলির শক্তির যোগফলের চেয়ে কম। শক্তির এই পার্থক্যকে নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি বলা হয়। ভর ও শক্তির তুল্যতা সূত্র থেকে জানা যায়, নিউক্লিয়াসের ভর-হ্রাস নিউক্লিয়নগুলির মধ্যে বন্ধন শক্তি রূপে ক্রিয়াশীল থাকে। কোন নিউক্লিয়াস যখন নতুন নিউক্লিয়াস গঠন করে তখন প্রথম নিউক্লিয়াসের 'বন্ধন শক্তি' যা আসলে "ভর-হ্রাস"-তাই শক্তি রূপে নির্গত হয় – এই হল পারমাণবিক শক্তি। পারমাণবিক শক্তি, **"নিউক্লিয়ার বিভাজন"** ও **"নিউক্লিয়ার সংযোজন"** –এই দুটি পদ্ধতিতে নির্গত হয়।

নিউক্লিয়ার বিভাজন ও চেন রিয়্যাকশন

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী অটোহান এবং স্ট্র্যাসম্যান, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে প্রায় সমভর ও প্রায় সমান আধান বিশিষ্ট দুটি খন্ডে বিভক্ত করেন।

ইউরেনিয়াম + নিউট্রন → বেরিয়াম + ক্রিপটন। এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র $_{92}U^{235}$ বিভাজন করা সম্ভব হয়েছিল। এই বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক উচ্চগতি সম্পন্ন নিউট্রন নির্গত হয়। একে নিউক্লিয় বিভাজন বলা হয়। (চিত্র ১)

নিউক্লিয় বিয়োজন

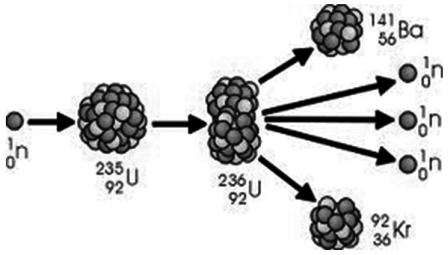

$$_{92}U^{235} + {}_{0}n^{1} \rightarrow {}_{92}U^{236} \rightarrow {}_{56}Ba^{141} + {}_{36}Kr^{92} + 3\,{}_{0}n^{1}$$

এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন $_{92}U^{235}$ এর সঙ্গে $_{0}n^{1}$ সংঘাতে প্রায় তিরিশ রকমের বিক্রিয়া হতে পারে, যার মধ্যে এটি একটি।

যেহেতু $_{92}U^{235}$ কে একটি নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে এর নিউক্লিয়াস থেকে একের অধিক নিউট্রন নির্গত হয়, সেহেতু চেন রিয়্যাকশন সম্ভব হয়। উচ্চ গতিশক্তি সম্পন্ন এই নিউট্রনগুলি অন্য ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটাতে পারে। কাজেই যথেষ্ট পরিমাণে ইউরেনিয়াম ($_{92}U^{235}$) মজুত থাকলে এবং একবার বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হলে তা অবিরাম চলতে থাকবে। প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেন রিয়্যাকশন ঘটে না।

নিউক্লিয় সংযোজন

এই পদ্ধতিতে হাল্কা মৌলের পরমাণু যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। হাইড্রোজেনের ৪টি নিউক্লিয়াস অর্থাৎ ৪টি প্রোটন

নিজেদের মধ্যে কুলম্বীয় বিকর্ষণ বল অতিক্রম করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হতে যথেষ্ট গতিশীল হতে হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে উপযুক্ত মাত্রায় গতিশীল করতে প্রাথমিকভাবে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই নিউক্লিয় সংযোজন [চিত্র ২] পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে শক্তি উৎপাদন করা এখনও সম্ভব হয় নি। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র থেকে নির্গত শক্তি প্রকৃতপক্ষে হিলিয়ামের বন্ধন শক্তি।

নিউক্লিয় সংযোজন

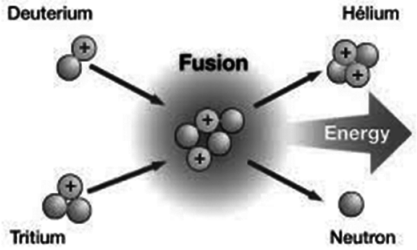

এই দুই পদ্ধতিতে উৎপন্ন আইসোটোপগুলি প্রাথমিকভাবে তেজস্ক্রিয় হয়। ফলে তাদের অর্ধায়ু অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মি তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এ থেকে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে কিছু রশ্মি ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্থ (α - রশ্মি), কিছু রশ্মি ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্থ (β রশ্মি) এবং অবশিষ্ট রশ্মি নিস্তড়িৎ (γ রশ্মি)। চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতেও এই পরীক্ষা সফলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে জানা গেছে যে, α -কণা প্রকৃতপক্ষে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস। β রশ্মি প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনের স্রোত। আরও পরে আবিষ্কার হয়েছে β কণা পজিট্রনও হতে পারে – যা ইলেকট্রনের অ্যান্টিপার্টিকেল। γ - রশ্মি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। γ - রশ্মিকে উচ্চশক্তির ফোটনের স্রোত রূপেও বর্ণনা করা যায়। নিউক্লিয়াস থেকে একটি α বা β কণা নিঃসরণের পর নিউক্লিয়াস উদ্দীপিত অবস্থায় থাকে। নিউক্লিয়াসটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সময় অতিরিক্ত শক্তি γ - রশ্মিরূপে নিঃসারিত হয়।

পরমাণু বোমার যে শক্তি অনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপন্ন ও নির্গত হয় নিউক্লিয় রিয়্যাকটরে সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন করা হয়। পরমাণু বোমা ও নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর – দু ক্ষেত্রেই নিউক্লিয় বিভাজন প্রক্রিয়ায় চেন রিয়্যাকশন ঘটে। প্রমাণ করা গেছে যে একটি নিউক্লিয়াস বিভাজনের ফলে মুক্ত নিউট্রন 10^{-9} সেকেন্ডের মধ্যে পরবর্তী নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে। নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটরে চেন রিয়্যাকশনের গতিশীল পথের প্রতি ধাপে নির্দিষ্ট সংখ্যক নিউট্রনকে ক্যাডমিয়াম দ্বারা শোষণ করে নেওয়া হয়। ফলে শুধুমাত্র অবশিষ্ট সংখ্যক নিউট্রনের পক্ষেই পরবর্তী সীমিত সংখ্যক নিউক্লিয়াসকে আঘাত করা সম্ভব হয়। এই নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া ধারাবাহিক কিন্তু এর দ্বারা উৎপাদিত শক্তি ক্রমবর্ধমান নয়। পরমাণু বোমায় এই প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমবর্ধমান। নিউক্লিয় রিয়্যাকটরে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের পরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যুক্ত বর্জ্য পদার্থকে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাবকে নূন্যতম করা সম্ভব – যা পরমাণু বোমার ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। নিউক্লিয় সংযোজন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে এখনও পর্যন্ত ঘটান সম্ভব হয় নি – শুধুমাত্র অনিয়ন্ত্রিত উপায়ের হাইড্রোজেন বোমা বানানো সম্ভব হয়েছে।

পরমাণু বিদ্যুৎ

পারমাণবিক চুল্লিতে চেন্ রিয়্যাকশনে উৎপন্ন উচ্চগতির নিউট্রনগুলিকে মন্দিভূত করার জন্য ভারীজল বা গ্রাফাইট ব্যবহার করা হয়–যাদের মন্দক (moderator) বলা হয়। **মন্দক নিউট্রন শোষণ করে না, নিউট্রনের শক্তি শোষণ করে।** এই মন্দক নিউট্রনগুলিই ${}_{92}U^{235}$ দ্বারা আত্তিকরণ এবং পরবর্তীতে এই ${}_{92}U^{236}$ বিভাজন সম্ভব হয়। চুল্লিতে একটি তাপরোধক পাত্রে মন্দক ভরে তার মধ্যে জ্বালানি দন্ড এমনভাবে সাজান হয় যাতে পরপর দুটি জ্বালানি দন্ডের দূরত্ব এমন হয় যাতে দ্রুত নিউট্রনগুলি গতি হারিয়ে তাপীয় নিউট্রনে পরিণত হতে পারে। বস্তুত ইউরেনিয়ামকে ছোট ছোট ধাতব পাত্রে ভরে-ঐ পাত্রগুলিকে ইস্পাতের চোঙের মধ্যে ভরে জ্বালানি দন্ড তৈরী করা হয়। [চিত্র ৩]

চুল্লিতে শৃঙ্খল বিক্রিয়ার যে কোন চক্রের শেষে ও শুরুতে নিউট্রন সংখ্যার অনুপাত (k) যাকে পরিবর্ধন গুণক (multiplication factor) বলা হয় তা একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। এই গুণকের মান এর উপর নির্ভর ক'রে চুল্লির তিনটি অবস্থা হতে পারে–

(ক) Critical অবস্থা – যখন $k=1$ হয়, এক্ষেত্রে চুল্লিতে নিউট্রনের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকে। ফলে কম অথচ একই হারে শক্তি উৎপাদন হয় এবং ঐ শক্তিকে একই হারে উচ্চচাপযুক্ত জল বা গ্যাসের সাহায্যে চাপরোধক পাত্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

(খ) Super critical অবস্থা – যখন $k\rangle 1$, এক্ষেত্রে শক্তি

উৎপাদনের হার সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে - এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাপ সঞ্চালন সম্ভব হয় না – ফলে চুল্লিটি গলে যাবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও পারমাণবিক বোমার মতন বিস্ফোরণ ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না – কারণ মূল জ্বালানি – পরমাণু বোমায় ব্যবহৃত বিশুদ্ধ $_{92}U^{235}$ নয় – বরঞ্চ বেশীরভাগই $_{92}U^{238}$ যা বিভাজনযোগ্য নয়।

(গ) Subcritical অবস্থা – যখন $k\langle 1$ হয়। এই অবস্থায় চুল্লিতে শক্তি উৎপাদনের হার ক্রমশ কমতে থাকে। $k=0$ হলে চুল্লিটি নিভে যায়।

k-এর মান অর্থাৎ নিউট্রনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ক্যাডমিয়ামের এক সেট নিয়ন্ত্রক দন্ড (control rod) ব্যবহার করা হয়। চাপরোধক পাত্রে মন্দকের মধ্যে, জ্বালানি দন্ডগুলির অন্তর্বর্তী ফাঁকে এই কন্ট্রোল রড ঢুকিয়ে নিউট্রন শোষণ করা হয়। এই কন্ট্রোল রডগুলিকে উঠিয়ে নামিয়ে চেন্ রিয়্যাকশন নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

নিয়ন্ত্রণ দন্ড ছাড়াও চুল্লিতে অতিরিক্ত এক সেট ক্যাডমিয়াম দন্ড থাকে – এগুলিকে নিরাপত্তা দন্ড (সেফটি রড) বলা হয়। জরুরিকালীন অবস্থায় এগুলিকে ব্যবহার করে k-এর মান 1-এর নিচে নামান হয় – অর্থাৎ চুলি- কে বিপদমুক্ত করা হয়।

চাপরোধক পাত্র থেকে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে কর্মীদের রক্ষা করার জন্য-চাপরোধক পাত্রটিকে মাটির নীচে মোটা কংক্রিটের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়।

চুল্লিতে উৎপন্ন শক্তি তথা তাপকে উচ্চ চাপ যুক্ত জল বা কোন সঞ্চালন মাধ্যম দ্বারা চুল্লির বাইরে এনে তাপ বিনিময় ব্যবস্থার সাহায্যে ঐ তাপ নিষ্কাশন ক'রে জল ফুটিয়ে স্টীম তৈরী করা হয়। ঐ স্টীমের সাহায্যেই টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া পরমাণু শক্তি এবং কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির ব্যবহার

১) চিকিৎসা ক্ষেত্রে

আমরা অনেকেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিকিরণ ও তেজস্ক্রীয় আইসোটোপের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে অবগত। প্রধানত : ডায়াগনোসিস (রোগ নির্ণয়) এবং থেরাপি (চিকিৎসায়)-এর ব্যবহার উলে- খযোগ্য। উন্নত দেশগুলিতে (বিশ্বের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ) রোগনির্ণয়ে প্রতিবছর ১.৯% জনসংখ্যার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিন ব্যবহার করা হয়। এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় এদের এক দশমাংশ।

বিশ্বব্যাপী ১০,০০০ এর বেশি হসপিটালে চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়। ইউ এস এ-তে ৩১১ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে প্রতিবছর ১৮ মিলিয়নকে নিউক্লিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি দেওয়া হয়। ইউরোপে সংখ্যাটা ৫০০ মিলিয়নে ১০ মিলিয়ন। প্রতিবছর রোগ নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয়-চিকিৎসা-ড্রাগের ব্যবহার বাড়ছে ১০%।

রোগ নির্ণয় ঃ- রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রেডিওআইসোটোপ একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিচ্ছবি ধারক যন্ত্র (imaging device) যেটা নিজে থেকে গামা রশ্মি নিঃস্বরন এবং তার লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশের চলমান পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। 'x-ray-র থেকে নিউক্লীয় প্রযুক্তি/কৌশল ব্যবহারের সুবিধা হল, এটি অস্থি এবং কোমল কলা (soft tissue) উভয়েরই প্রতিচ্ছবি খুব নিখুঁতভাবে নিতে পারে।

Radio pharmaceuticals ব্যবহার করে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রুগীকে একটি তেজস্ক্রিয় ডোজ দেওয়া হয়। তার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এটা করা হয় দ্বিমাত্রিক ছবির অথবা tomography নামক একটি প্রযুক্তি দ্বারা যেখানে ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া যায়।

রেডিও আইসোটোপের অন্য প্রধান ব্যবহার হল পরীক্ষাগারে জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য তেজস্ক্রিয় বিশুদ্ধিকরণ পরীক্ষায় (radio-immuno-assays) অতি কম ঘনত্বের হরমোন, এনজাইম, হেপাটাইটিস ভাইরাস, কিছু ড্রাগ এবং রুগীর রক্তের নমুনায় অন্যান্য বস্তুর চলাচল – পরিমাপের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত রেডিও আইসোটোপ কখনো রুগীর সংস্পর্শে আসে না। হিসেব করে দেখা যায় কেবল ইউ এস এ-তেই প্রতিবছর ৪০ মিলিয়ন এরূপ পরীক্ষা করা হয়। ইউরোপে করা হয় ১৫ মিলিয়ন।

* কিডনীর রোগ নির্ণয় – Na - 24 ব্যবহৃত হয়।

* রক্তের রোগ নির্ণয় – P - 32, Cr - 51 ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসায় :- (Therapy)

থেরাপিতে রেডিও আইসোটোপের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম হলেও গুরুত্বপূর্ণ। রেডিয়েশনের মাধ্যমেCancerous growths ধ্বংস করা হয়। এটা কোবাল্ট ৬০ থেকে নির্গত গামা রশ্মি ব্যবহার করে বাইরে থেকে করা যায়। আবার স্বল্প গামা বা বিটা radiation উৎস শরীরের অভ্যন্তরে ব্যবহার করেও করা যায়।

Iodine - 131 সাধারণত থাইরয়েড ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটা সম্ভবতঃ ক্যান্সার চিকিৎসার সর্বাধিক সফল পদ্ধতি এবং মারাত্মক নয়। Iridium - 192 wire implants ব্যবহার করা হয় বিশেষতঃ মস্তিষ্ক ও স্তনের সীমিত জায়গায় বিটা রশ্মির যথাযথ

ডোজ দিতে। পরে এই implant তুলে নেওয়া হয়। অস্থির সেকেন্ডারী ক্যান্সারের ব্যথা যন্ত্রণা নিরাময়ের জন্য একটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে organic phosphate সহযোগে Samarium -153 মিশ্রন ব্যবহার করা হয়।

* লিউকোমিয়া, ব্রেনটিউমার চিকিৎসায় – P - 32 ব্যবহৃত হয়।

* গলগন্ড – I - 131 *চর্মরোগ - P - 30 ব্যবহৃত হয়।

* পারমানবিক শক্তিচালিত পেসমেকার ব্যবহার পরিচিত।

* কৃত্রিম হৃদযন্ত্র তৈরীতে – প্লুটোনিয়াম –239 এর ব্যবহার হয়।

জীবাণু মুক্ত করণ ঃ অনেক মেডিকাল প্রোডাক্ট আজকাল cobalt - 60 নির্গত গামা রশ্মি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয়। এই প্রযুক্তি সাধারণত বাষ্প-তাপ-বিশুদ্ধিকরণের থেকে অনেক বেশি কার্যকরী। গামা রশ্মি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করণের একটি উদাহরণ disposal সিরিঞ্জ। তাপ সংবেদনশীল বস্তু যেমন – powders, ointments, solution এবং জৈবিক প্রস্তুতি (preperations) যেমন- bone, nerve, skin ইত্যাদি যেগুলি টিসু গ্রাফটে ব্যবহার হয় - এগুলিকে জীবাণুমুক্ত করতে "শীতল" পদ্ধতির বিকিরণ কাজে লাগান হয়।

বিকিরণের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণে মানবজাতি প্রভূত উপকৃত হয়েছে। এটা নিরাপদ, কারণ বস্তুকে প্যাকেটজাত করার পরও এটা করা যেতে পারে। সিরিঞ্জ ছাড়াও বিভিন্ন মেডিক্যাল প্রোডাকটস যেমন - cotton, wool, burn dressings, surgical gloves, heart valves, bandages, plastic, rubbar sheets এবং surgical instruments প্রভৃতি বিকিরণ পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

২) কৃষিক্ষেত্রে

সার ঃ নাইট্রোজেন-১৫ এবং ফসফরাস-৩২ নামাঙ্কিত সারগুলি নির্দেশ করে, গাছ কি পরিমানে এটা গ্রহণ করতে পারে এবং কতটা নষ্ট হয়। নাইট্রোজেন-১৫ এও ধারণা দেয় যে, মাটি কি পরিমান নাইট্রোজেন বায়ু থেকে জমা করবে এবং সিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের (legumes) মূল ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা।

জিনগত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি ঃ কয়েক দশক ধরে plant breeding - এ মিউটেশনের জন্য (ionising radiation) আয়নী তেজস্ক্রিয়তা কাজে লাগানো হচ্ছে। এভাবে ১৮০০ প্রজাতির শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। নতুন জিনগত root and tuber crops, cereals and oil seed crops উৎপাদনে গামা বা নিউট্রন বিকিরণ (irradiation) অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

এই নতুন ধরনের জোয়ান, আদা, গম, কলা, বিন (beans) এবং লঙ্কা অধিকতর কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। এবং এরা রুক্ষ পরিবেশে অধিকতর সহজে মানিয়ে নিতে পারে। মালিতে জোয়ান ও ধানের বীজের irradiation - দ্বারা অধিকতর ফলনশীল ও বৈচিত্র্যময় করা সম্ভব হয়েছে।

পতঙ্গ দমন ঃ পতঙ্গের ডিমগুলিকে বাচ্চা ফুটে বেড়োনোর আগেই গামা বিকিরণের মাধ্যমে নির্বীজিত করা হয়। উপদ্রুত অঞ্চলে এভাবে প্রচুর সংখ্যায় নির্বীজিত পুরুষ পতঙ্গের জন্ম হয়। তখন তারা মেয়ে পতঙ্গের সাথে মিলিত হলেও অপত্যের জন্ম হতে পারে না। এভাবে নির্বীজিত পুরুষ পতঙ্গের পরস্পর উৎপাদনে প্রকল্পিত অঞ্চলে (projcet area) ক্ষতিকারক পতঙ্গের সংখ্যা মারাত্মক কমে গেছে।

খাদ্য সংরক্ষণ ঃ অনেক দেশেই মজুতজাত ফসলের ২৫-৩০% এর মত নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্ন জীবাণু (microbes) এবং ক্ষতিকর কীটের আক্রমণে। কীটের আক্রমণ এবং দূষনের জন্য যে নষ্টের পরিমাণ, তাকে কমানো হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর সর্বত্রই খাদ্য সংরক্ষণের জন্য বিকিরণ প্রযুক্তির (irradiation technology) ব্যবহার বেড়ে চলেছে। ৪০ টিরও বেশি দেশের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ৬০ প্রকারেরও বেশি খাদ্যের জন্য irradiation কে সমর্থন করছে। শুষ্ক ফল এবং শস্য, গুঁটী এবং মসলা থেকে ক্ষতিকর কীট নির্মূল করতে অত্যন্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক ধোঁয়া/বাষ্পের পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (irraoliation) ব্যবহার করা শ্রেয়।

ফসল মজুতজাত করার পর অপচয় কমার সাথে সাথে খাদ্যবাহিত রোগ সম্বন্ধীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি খাদ্যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার বাড়িয়ে নিচ্ছে। এবং আহার্য সামগ্রীর গুণগত উৎকর্ষতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ছে। নভোচারীরা তাদের মহাকাশ অভিযানকালে এই তেজস্ক্রীয় বিকিরণের সংরক্ষিত খাদ্যই খায়।

Food irradiation হল, উচ্চ স্তরের গামা বিকিরণে কাঁচা খাবারকে উন্মুক্ত করা। এতে খাদ্যের পুষ্টিগুণকে প্রভাবিত না করে অথবা কোন বর্জ্য না জমিয়ে খাদ্যের ব্যাক্টেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকারক জীবাণু মেরে ফেলে। **নিশ্চিতভাবে বলা যায়, খাদ্যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ খাদ্যকে তেজস্ক্রিয় করে না।**

৩) শিল্প ক্ষেত্রে

পরিবেশগত সন্ধানী ঃ দূষক পদার্থকে নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতেও রেডিও আইসোটোপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ এমনকি অতি সামান্য রেডিও আইসোটোপকেও সহজে চিহ্নিত করা যায়। এবং স্বল্পায়ু আইসোটোপের কোনও অবশেষ পরিবেশে জমে না।

শিল্পীয় সন্ধানী (Industrial tracers) ঃ অতি সামান্য পরিমাণ

তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয়ের ক্ষমতার জন্য শিল্পক্ষেত্রে রেডিওআইসোটোপগুলির 'সন্ধানী' হিসেবে ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মেটেরিয়ালের সাথে সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশিয়ে সেই মিশেলের(the mixing) এবং, তরল, পাউডার ও গ্যাস সহ সে মেটেরিয়ালের প্রবাহ হার পর্যবেক্ষণ করা এবং ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

লুব্রিকেটিং তেলের সাথে তেজস্ক্রিয় সন্ধানী মিশিয়ে ইঞ্জিন এবং উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ক্ষয়ের হার নির্ণয় করা যায়।

যন্ত্রপাতি ঃ প্রত্যেক শিল্প কারখানায় পরিমাপক যন্ত্রে তেজস্ক্রিয় উৎস ব্যবহার বহুল পরিমাণে হয়। এর দ্বারা গ্যাস, তরল ও কঠিন পদার্থের স্তর পরীক্ষা করা হয়।

পেপার, প্লাস্টিক ফিল্ম, ধাতু, কাঁচ প্রভৃতির দীর্ঘ পাত বানাতে যখন মাপযন্ত্র এবং বস্তুর পারস্পারিক সংস্পর্শে আসাকে পরিহার করার প্রয়োজন হয় তখন Radioisotope thickness gauges ব্যবহার করা হয়।

ডেনসিটি gauge ব্যবহার হয়, যখন তরল, পাউডার বা কঠিন পদার্থে পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ ডিটারজেন্ট প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রেডিওগ্রাফি ঃ রেডিওআইসোটোপ যেগুলি গামা রশ্মি নিঃসরণ করে সেগুলি এক্স-রে মেশিনের থেকে সহজে স্থানান্তকরণ যোগ্য এবং উচ্চ মানের বিকিরণ ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই তাদের (নতুন) তৈরী গ্যাস ও তেলের পাইপলাইনের ঢালাই চেকিং-এ ব্যবহার করা হয়। এটা করা হয় পাইপের ভিতরে তেজস্ক্রিয় উৎস রেখে এবং ঢালাই-এর বাইরে ফিল্ম রেখে।

রেডিওগ্রাফির অন্যান্য গঠনগুলি (neutron radiography/ autoradiography) বিভিন্ন কার্যনীতির ভিত্তিতে পদার্থের বেধ ও ঘনত্ব পরিমাপ করতে অথবা যেসব উপাদানকে অন্য উপায়ে দেখতে পাওয়া যায় না তাদের চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।

৪) গবেষণাক্ষেত্রে

জলসম্পদ ঃ আইসোটোপ হাইড্রোলজি টেকনিক ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের ব্যাপ্তির সঠিক সন্ধান ও পরিমাপ করতে পারে। বিদ্যমান জল সরবরাহ এবং নতুন ও নবীকরণযোগ্য জল-উৎস নির্ণয় করে ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে এ কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এটা উৎপত্তি, বয়স, ভুগর্ভস্থ জল বন্টন এবং ভূগর্ভস্থ ও উন্মুক্ত জলের (গ্রাউন্ড অ্যান্ড সার্ফেস ওয়াটার) মধ্যে সংযোগ এবং জলাধার (অ্যাকুইফার) রিচার্জ (পূর্ণ করা) পদ্ধতি সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়। সে ফলাফল জল সম্পদের sustainable ব্যবস্থাপনার জন্য নকশা বানাতে সাহায্য করে।

ভূপৃষ্ঠস্থ জলের ক্ষেত্রে ঃ এ কৌশল বাঁধ ও জলসেচ নালার ছিদ্র হ্রাস ও জলাধারের গতিশীলতা, প্রবাহ হার, নদী ভরাট এবং অধক্ষেপের (sedimentation) / পলির হার সম্পর্কিত তথ্য দিতে পারে। আফগানিস্তান থেকে জাইরে, উন্নত ও উন্নয়নশীল মিলিয়ে ৬০টির মত দেশ আছে, যারা তাদের জল সম্পদ পর্যবেক্ষণের জন্য এই টেকনিক কাজে লাগাচ্ছে।

নিউট্রন প্রোবস খুব সঠিকভাবে মাটির আর্দ্রতা পরিমাপ করতে পারে। এর ফলে বিশেষ করে কৃষি ভূমি যেটা লবনাক্ত তার ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়।

রেডিও আইসোটোপ শক্তি উৎস ঃ

কিছু রেডিওআইসোটোপ যখন তাদের ক্ষয়প্রাপ্তি হতে থাকে তখন প্রচুর শক্তি নির্গত করে। এই শক্তি হার্ট পেসমেকার-এ, সমুদ্র যাত্রায় আলোক সংকেতে এবং কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্লুটোনিয়াম ২৩৮-এর তাপ ক্ষরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মহাকাশ যানে শক্তির যোগান দিচ্ছে। এটা ক্যাসিনি স্পেস প্রোব-এর শনিগ্রহে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শক্তি যোগাচ্ছে এবং এটা মার্স সায়েন্স ল্যাবরেটরিতেও শক্তি সরবরাহ করছে।

বয়স নির্ণয় (ডেটিং)

রেডিওআইসোটোপ বিশ্লেষণের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পাথর ও অন্যান্য পদার্থের বয়স নির্ণয় করতে। এটা ভূতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ব বিদদের গবেষণার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারে প্রধান সমস্যা কি?

(১) খনি থেকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌল (ইউরেনিয়াম) উত্তোলন। এই ধরনের খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শিকার হতে হয়। এর থেকে শ্রমিকদের রক্ষা পেতে শ্রমিকদের উপযুক্ত মানের তেজস্ক্রিয় প্রতিরোধক পোষাক ব্যবহার করার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে শ্রম-সময়, সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা যথেষ্ট কম হওয়া প্রয়োজন।

(২) শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কাঁচা মাল যেমন ইউরেনিয়াম ও নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটরের বিকিরণ এবং বর্জ্য পদার্থে উপস্থিত কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলের বিকিরণ – সব মিলিয়ে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে রিয়্যাকটরের বিকিরণ হ্রাস করার ব্যবস্থা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে এর জন্য কতকগুলি ভৌত ও রাসায়নিক ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়েছে। রিয়্যাকটর ও কর্মচারিদের কাজের এলাকার মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তার মধ্যে মধ্যে ভৌত বাধা দান করার ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়েছে। রিয়্যাকটরের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয় - কর্মীদের উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে বসিয়ে রিমোট কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট দ্বারা। চূড়ান্ত নিরাপত্তার জন্য 'defence in depth' approach নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও একান্তভাবে প্রয়োজন 'শ্রম-সময়' হ্রাস করা।

(৩) বর্জ্য পদার্থ নিষ্ক্রমণ – তেজস্ক্রিয় মৌল যুক্ত বর্জ্য পদার্থ্য সঠিকভাবে নিষ্ক্রমণ করতে না পারলে - তা নানাবিধ সমস্যার কারণ হতে পারে। প্রাথমিকভাবে জনবসতিহীন এলাকায় মাটির তলায় সীসার বাক্স বন্ধি করে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হত। কিন্তু দেখা গেছে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের মত হল–

(ক) পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে মহাশূন্যে - রকেটের মাধ্যমে এই বর্জ্য নিক্ষেপ করা। বর্তমানে এই পদ্ধতি প্রচুর ব্যয়বহুল হওয়ায় তা লাগু হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

(খ) সমুদ্রের তলায়, লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট সীমান্তের সাবডাকশন জোনে সাবডাকটিং প্লেটের উপর গর্ত খুঁড়ে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যকে নিক্ষেপ করা – যা ধীরে ধীরে (বছরে প্রায় ৫-১০মিলি মিটার) পৃথিবীর গুরুমন্ডলে (mantle) মিশে যাবে। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় মৌল আবার প্রকৃতিতে ফিরে যায়। এই পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক কম খরচের।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্ক্রমণের এই দুটি পদ্ধতিই মানব সভ্যতার উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাবকে প্রায় শূন্যে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে বর্তমানে ভারতমহাসাগর, প্রশান্তমহাসাগর ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের যত্রতত্র এই বর্জ্যপদার্থ নিক্ষেপ করা হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সাথে সাথে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি যা প্রকৃতিতে ছিল না কৃত্রিমভাবে সংযোজিত হচ্ছে। এর প্রভাবে সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামুদ্রিক জীবজগতের প্রবল ক্ষতিসাধন হচ্ছে, অপ্রাকৃতিক কারণে জৈব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল বর্জ্য পদার্থ নিষ্ক্রমণের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার সত্ত্বেও পরমাণু বর্জ্য অবৈজ্ঞানিকভাবে ডাম্পিং করা হচ্ছে কেন? এর একমাত্র কারণ হল – পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির (এদেশে এবং বিদেশে)–তা সরকারী হোক অথবা প্রাইভেট লক্ষ্য মানব কল্যাণ নয়; উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি বিক্রি করে মুনাফা করা। এর ক্ষতিকারক দিক নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। একমাত্র এর ক্ষতিকারক দিক নিয়ে জন আন্দোলন হলেই তারা একটু নড়ে চড়ে বসে, আবার যে কে সেই! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, শুধু পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয় সকল ধরণের বিদ্যুৎ এবং শিল্প-কৃষি উৎপাদনের সময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য একই থাকে-মুনাফা, মানব কল্যাণ নয়।

সমগ্র আলোচনা থেকে উঠে আসে যে, পারমাণবিক শক্তি মানব সমাজে শুধু ক্ষতিই করে নি, অসংখ্য উপকারও করেছে ও করে চলেছে। দেখা গেল নাগাসাকিতে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ নির্মিত, "ফ্যাটম্যান" যে অপরিসিম ক্ষতি সাধান করেছে, সেই প্লুটোনিয়াম-২৩৯ কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্রের চালিকাশক্তি। সুতরাং কি উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উৎপাদন ও ব্যবহার হচ্ছে সেটাই বিচার্য্য বিষয়। চিকিৎসাবিদ্যায় বহু জীবনদায়ী ঔষধ অপব্যবহারের ফলে জীবন নাশও হতে পারে। ঘুমের ঔষধ যেমন ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তেমনি কখনো কখনো তা আত্মহত্যার উপায় হয়ে ওঠে। শল্য চিকিৎসার পূর্বে চেতনা নাশক রূপে যে মরফিন ব্যবহার করা হয় – সেই মরফিনের অপব্যবহারে মৃত্যু অনিবার্য। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক যেমন কীটের হাত থেকে ফলনকে রক্ষা করে - তেমনি এই কীটনাশক ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যার উপায় হয়ে ওঠে। এরকম আরও কত কি না আছে। ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিমান তথা মাত্রা নির্ধারিত হয়।

পরমাণু শক্তির আত্মপ্রকাশ এত ভয়াবহ হওয়ার কারণ যে অপপ্রয়োগ-এটা নিশ্চিত। কিন্তু এই অপপ্রয়োগের কারণ কি?

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত পরমাণু নিয়ে গবেষণা যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল তাতে এটা নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল যে তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াসের রূপান্তর ঘটালে কিছু পরিমাণ শক্তির মুক্তি ঘটে। এই শক্তিকে যদি গুণিতক আকারে বাড়ান যায় তবে তা যুদ্ধের মারণাস্ত্র রূপে ব্যবহার করা যাবে। যুদ্ধচলাকালীন সময় সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য পরমাণুশক্তির বিপুলতা ও ভয়াবহতা জাহির করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পরেছিল। বিশ্ব বিখ্যাত বহু বিজ্ঞানী এ বিষয়ে সহমত ছিলেন। বিশ্বের নাম করা বিজ্ঞানীদের একটি অংশ তখন জার্মানিতে এবিষয়ে গবেষণা করছেন, জার্মান নাৎসি বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য গতির সঙ্গে যদি পরমাণু বোমা যুক্ত হয় তবে বিশ্বের মানচিত্রের শুধু রাজনৈতিক চরিত্র নয় প্রাকৃতিক চরিত্রটাও বদলে যাবে – এই ধারণা তৎকালীন বিজ্ঞানীদের অনেকেরই ছিল, জার্মানির এই সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে আমেরিকায় গড়ে উঠল "ম্যান হাটন" প্রোজেক্ট যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য যে পরমাণু বোমা তৈরী ও মানুষের ধ্বংসের জন্য তার ব্যবহার এটা অধিকাংশ বিজ্ঞানীরই অজানা ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ এ আমেরিকার নিউমেক্সিকোর লস্–অ্যালামসে তৈরী হল পরমাণু বোমা। কার্যত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষ ঘোষণা হওয়ার অবস্থায় পৌছানোর পরে আমেরিকা-জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণ করে। এই বোমা বর্ষণের কারণ যেমন ছিল এই বোমার ক্ষতিকারক ক্ষমতার বাস্তব প্রত্যক্ষকরণ। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ছিল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় সমগ্র বিশ্বে মার্কিন শক্তির একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা করা।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার না করার যুক্তি কি চেরনোবিল এবং ফুকুসিমা দাইচির - দুর্ঘটনা, হতে পারে?

যতদূর জানা যায় পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের (পুঁজিবাদে অধঃপতনের পর) চেরনোবিলের দুর্ঘটনা ঘটেছিল প্লান্টের সুপার কুলিং ব্যবস্থার ব্যবহার না করায়। জাপানে ২০১১ সালে পারমাণবিক চুল্লি সুনামির আঘাতে নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জাপান দেশটি পুরোপুরি কনভারজেন্ট প্লেট সীমান্তে অবস্থিত আইল্যান্ড আর্ক এর অংশ। এখানে নিয়মিত বড় ভূমিকম্প ও সুনামি হয়। এটা জানা সত্ত্বেও এখানে পরমাণু চুল্লি স্থাপন ছিল সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং দুটি ঘটনাকেই নিছক দুর্ঘটনা বলা যায় না।

দুর্ঘটনার জন্য কোন শিল্প বা উন্নয়ণমূলক কাজ বন্ধ হয় নি, হতে পারে না। সারা বিশ্বজুড়ে ট্রেন দুর্ঘটনা, বাস দুর্ঘটনা, খনি দুর্ঘটনা শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা কি কম ঘটেছে? দুর্ঘটনার জন্য এসব কিছু কি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? যাদের বাড়ীর লোক যে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন সেই বাড়ীর লোক সেই দুর্ঘটনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন? নাকি ত্যাগ করা সম্ভব? প্রেসারকুকার বার্স্ট করে নি? গ্যাস সিলিন্ডার বার্স্ট করে নি? মোবাইল ফোনের ব্যাটারি বার্স্ট করে নি? বিদ্যুৎ-পিষ্ট হয়ে লোক মারা যায় নি? নাকি আর কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে না!

শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী কী ?

সভ্যতার অগ্রগতিতে শক্তির তথা বিদ্যুৎশক্তির অবদান অপরিসীম। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের গতি ও উৎপাদনশীলতা প্রতিস্থাপিত হয়েছে বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন দ্বারা। বিদ্যুৎ – শিল্প-কারখানা, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ, আদালত থেকে গৃহস্থালী – সর্বত্রই নিত্য সঙ্গী। এর অপরিহার্যতা কতটা তা লোডশেডিং হলেই টের পাওয়া যায়। বিদ্যুৎই ২৪ ঘন্টার পূর্ণ দিবসকে ২৪ ঘন্টার কর্মদিবসে পরিণত করেছে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে উৎসগুলি পাওয়া যায় তার কতগুলি পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং কতগুলি তা নয়। পুনর্নবীকরণযোগ্য নয় এমন উৎসগুলির মধ্যে কয়লাই প্রধান। কিন্তু মানব সভ্যতার সময়সীমার নিরিখে এই কয়লার ভান্ডার একদিন শেষ হবে। পৃথিবীর সর্বত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরীর সুযোগ নেই। ভারতের মত দেশগুলিতে – জলবিদ্যুতের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও – ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা, হরকা বান-এর সম্ভাবনা প্রভৃতি বিচার না করে এবং রাজনৈতিক কারণে স্থাপিত জলবিদ্যুৎ নানা দুর্ঘটনার জন্ম দিয়েছে। অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি (জোয়ার-ভাটা, বায়ুপ্রবাহ, সৌরশক্তি ইত্যাদি) থেকে অবিরাম একই গতি ও তীব্রতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। ফলে এর থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তি শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা কতদূর বাস্ড়ব সম্মত! তবে এই অজচিরাচরিত শক্তির উৎস থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তিকে গৃহস্থালী, রাস্তা-ঘাটের বাতি ইত্যাদি বিভিন্ন পৌর কাজে ব্যবহার করা সম্ভব এবং উচিত।

সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য – বিজ্ঞানের সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দিতে – শক্তির সকল উৎসকেই ব্যবহার করা উচিত। শক্তির উৎসগুলির মধ্যে পারমাণবিক শক্তিই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে ভর – শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতিতে কাঁচা মাল স্বরূপ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। এই ইউরেনিয়াম-এর পরিমাণও মানব সভ্যতার অগ্রগতির নিরিখে সীমিত। নিউক্লিয়ার সংযোজন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে শক্তি উৎপাদন করার গবেষণা চলছে। এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ভান্ডার হল সমুদ্রের ভারী জল। এই পদ্ধতি সফল হলে এটা জোর গলায় বলা যায় যে মানব সভ্যতার শক্তির সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে।

বর্তমান বিশ্ব যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে তার একমাত্র লক্ষ্য হল – মুনাফা। মুনাফা বৃদ্ধি করতে উৎপাদন খরচ যতদূর সম্ভব কম করা। আর এই উৎপাদন খরচ কমানোর জায়গা হল শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা, শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য খরচ না করা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্ক্রমণের তথা পরিবেশগত দিক সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব খরচ কম করা। শুধুমাত্র পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্র নয় – প্রতিটি শিল্প ক্ষেত্রেই একই চিত্র। বর্তমান সমাজে সব কিছুই পণ্য। তাই পরমাণু শক্তি ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির উপকারিতা পেতে হলে – তাদের বাজার থেকে আমাদের কিনতে হবে। সুতরাং **পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী এবং সমস্ত মানুষের নিরাপত্তার জন্য আবিষ্কৃত সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবিলম্বে চালু করা, এর সুফলগুলি সকলের কাছে পৌঁছানো এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা – এই দাবিগুলিই হল প্রগতিশীল দাবি।** মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদনের জন্য, মালিকশ্রেণীর ত্রুটির জন্য, নিস্পৃহতার জন্য, তাদের ক্ষমতা দখলের যুদ্ধের জন্য যে বিষময় ফল আমরা দেখি তার জন্য বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারকে মানবসমাজের কল্যাণে ব্যবহার হতে বাধা দান করা কি প্রগতিশীলতা? না, এটা প্রগতিশীল চেতনা নয়। প্রগতিশীল চেতনা তাকেই বলে যা মানব সমাজের বিকাশের পক্ষে, উন্নতির পক্ষে।

অনেকে বলেছেন পরমাণু শক্তির বিষয়ে পরীক্ষাগারে গবেষণা করা যেতে পারে – এর বেশি কিছু করা উচিত নয়। তাদের উদ্দেশ্যে বলা প্রয়োজন গবেষণার কাজে যে অর্থ প্রয়োজন হয় তা আসে ব্যবস্থার পরিচালকদের কাছ থেকে। তাঁরা অর্থকে পুঁজি রূপেই লগ্নি করে। তাই গবেষণা কোন্ স্বার্থে হবে সেটা তাঁরাই ঠিক করে – গবেষকরা নয়। এই গবেষণা

ছোট্ট একটি ল্যাবরেটরির মধ্যে সম্ভব নয়। মানব সমাজে যে গবেষণার প্রয়োগ নাই তা সমাজে কাছে অর্থহীন। তাছাড়া শুধুমাত্র ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করেই তো পরমাণু বোমা তৈরী হয়েছিল। জীবাণু বোমা তৈরী হচ্ছে।

পরমাণু বোমার ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার পরও কোনও রাষ্ট্রই যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নি। বরঞ্চ প্রতিটি দেশের সামরিক মর্যাদা, অহঙ্কার ও হুমকি দেওয়ার শক্তি হয়েছে পরমাণু-শক্তি। বিশ্ব তথা প্রতিটি রাষ্ট্রই শ্রেণী বিভক্ত। পুঁজিপতি শ্রেণী সারা বিশ্বে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম রেখেছে। এই ব্যবস্থাটা জন-কল্যাণমুখী নয়। এই ব্যবস্থায়, 'অর্থ' রূপ ধারণ করেছে 'পুঁজি'র। 'সেবা' প্রতিস্থাপিত 'পরিষেবা' দ্বারা, প্রয়োজন প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'চাহিদা' দ্বারা।

আজ আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামে সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছায় নি, সকলের প্রয়োজনীয় শিল্প উৎপাদন পেতে উৎপাদনের বিপুল বিকাশ প্রয়োজন। আমরা চোখ খোলা রাখলেই দেখতে পাই – সকলের প্রয়োজন মেটে নি, কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রগুলি অতি উৎপাদনের সঙ্কটে ভুগছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন ও পণ্য সরবরাহ হয় 'চাহিদা ও যোগানের' নিয়মে। এই ব্যবস্থায় প্রয়োজন ও চাহিদা এক বিষয় নয়। যাদের পণ্য ক্রয় করে প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে তাদের প্রয়োজনটাই হল চাহিদা। আর যাদের ক্রয়ক্ষমতা নাই তাদের প্রয়োজনটা চাহিদা নয়।

তাহলে পরমাণু শক্তির উৎপাদন ও তার জনকল্যানমুখী ফল পাওয়ার সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা কি পরমাণু শক্তি? সমস্যাটা কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার? সমস্যাটা কি তার ব্যবহার? নাকি সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণে এর সুফল না পৌঁছানো? বৈজ্ঞানিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানুষের ধ্বংসে একে কাজে লাগানোর জন্য পুঁজির মালিকশ্রেণী এবং তার ব্যবস্থা দায়ী। পরমাণু শক্তিসহ পৃথিবীর সকল সম্পদ প্রকৃত অর্থে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে হলে এই ব্যবস্থা অবসানের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে – ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে মানব প্রগতির বিরুদ্ধে যাওয়া বিজ্ঞান মনস্কতা নয়। পরিবেশবাদী দৃষ্টিকোণের থেকে পরিবেশ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য এটাই।■

পাঠকের কলাম ঃ

জনগণের মিছিল

– ঝুমা সমাদ্দার

আমি যতগুলো মিছিলে গিয়েছি, সবগুলোর সুর ছিল একই। জনগণের মিছিল। স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল। ঘর ছেড়ে শুধু দুই পা বেরোতেই দলে দলে মানুষের দেখা মিলেছে।

রাস্তায় দূরদূরান্ত পর্যন্ত মানুষের লাইন। বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল একশো শতাংশ। কিন্তু হয়নি। সুশৃঙ্খলভাবে পা মিলিয়েছে জনতা। গলা মিলিয়ে গান গেয়েছে জনতা।

পেছন থেকে হঠাৎ ডাক কানে এসেছে, "ম্যাম, আমি এসেছি।" দেখা হয়েছে পুরনো ছাত্রীদের সঙ্গে। বর্তমানে কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি বেশ দূর থেকে অত রাতে মা, বোন'কে নিয়ে এসেছে মিছিলে। সোচ্চারে মুঠো হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছে। এই এত্তোটুকু মেয়ে ছিল সে, কবে যে এত বড় হল!!

আশেপাশের ঘরের ভেতরে যাঁরা ছিলেন, যাঁরা কোনো কারণে মিছিলে পা মেলাতে পারেন নি, তাঁরাও 'ওরে দেখবি আয় রে' ডাক দিয়ে, পাশে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি জানিয়েছেন। কোলকাতা শহরে রাস্তার ধারের বাড়িগুলি সারাদিনই শব্দের অত্যাচারে জেরবার। কিন্তু এ চিৎকার তাদের কাছে শ্রুতিমধুর মনে হয়েছে।

মধ্যরাতে যখন মিছিল শেষ হয়েছে, মেলা ভাঙার মতই দলে দলে মানুষের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছি। অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। পোস্টার বিনিময় হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়া সম্মিলিত জনগণের মধ্যে উদারতা যেন সংক্রমিত হয়েছে।

কিন্তু শঙ্কাও একটা রয়ে গেছে। আমরা কি মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হতে পেরেছি, যে বুকের ভেতর এই আগুনটা যেন সহজে না নেভে? আমরা কি পারবো পৃথিবীর যেখানে যতো অন্যায়, অসমতা, অবিচার আছে তার বিরুদ্ধে এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ করতে? নাকি এটা একটা ঘটনা বিশেষের তাৎক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ? দাবানলে পরিণত হতে পারবে কি তা? ছড়িয়ে পড়বে গোটা দেশে? নিরক্ষেপভাবে? ■

বিজ্ঞানের খবর

মে. ১. ●মস্তিষ্ক হল চিন্তন, মনন, আবেগ ও বিভিন্ন জৈব-অনুভূতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উৎসস্থল। এছাড়াও মস্তিষ্ক যে শরীরের রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার ইঙ্গিত বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেও তার ক্রিয়া কৌশল সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। সম্প্রতি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল স্নায়ুবিজ্ঞানী এক গবেষণাপত্রে প্রকাশ করেছেন ইঁদুরের মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশ কিভাবে রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। (নেচার)

৩. ●চীনের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চাঁদের উদ্দেশ্যে চ্যাং-৬ মহাকাশযান পাঠালেন যা চাঁদের অপরপৃষ্ঠ অর্থাৎ যে পৃষ্ঠটি পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান নয় সেই পৃষ্ঠে অবতরণ করবে। রোবটিক যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে চাঁদের মাটির নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করবে। চীনা মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, চ্যাং চন্দ্রাভিযানগুলির উদ্দেশ্যে হল ২০৩০ খ্রিস্টাব্দে চাঁদের মাটিতে মহাকাশচারী পাঠানো। বর্তমান মিশনটি সম্পূর্ণ হতে সময় লাগবে ৫৩ দিন। (দ্য গার্ডিয়ান)

৬. ●বিজ্ঞানীরা আগেই প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহ শুক্রতে একদা পৃথিবীর মতো জল ছিল, বর্তমানে যা শুষ্ক। কিন্তু কিভাবে জল উধাও হল তা বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল এক রহস্য। দীর্ঘ দশ বছর ব্যাপী গবেষণায় এই রহস্যের সমাধান হতে চলেছে। পৃথিবীর ৯২ গুণ বায়ুমন্ডলীর চাপে ও ৪৬৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রায় শুক্রের বায়ুমন্ডল কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড বাষ্পে ঠাসা। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন অতীতে শুক্রের বায়ুমন্ডলে যে জলীয় বাষ্প ছিল তা HCO^+ আয়নের এক বিশেষ বিক্রিয়ায় কার্বন-মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। (নেচার)

৮. ●কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আলফাফোল্ড-৩ নামে একটি মডেল বানিয়েছে গুগুল। এই মডেল ব্যবহার করে প্রোটীন, ডিএনএ, আরএনএ-র মতো জটিল জৈব-অণুর গঠন আরও নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব হয়েছে ও বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্রিয়া কৌশল জানা সম্ভব হয়েছে। (গুগুল)

●মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা প্রেরিত জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ পৃথিবী থেকে ৪১ আলোকবর্ষ দূরের একটি বহির্গ্রহের সন্ধান পেয়েছে যার নাম ৫৫-ক্যাঙ্ক্রি ই। গ্রহটির নিকটবর্তী নক্ষত্রের থেকে মাত্র ২২.৫ লক্ষ কিমি দূরে থাকার কারণে গড় তাপমাত্রা ২৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে, বহির্গ্রহটি প্রস্তরময় এবং বায়ুমন্ডলে ফুটন্ত লাভার বাষ্পের সাথে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড উপস্থিত থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। গ্রহটিতে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রায় না থাকলেও পৃথিবী বা মঙ্গল গ্রহের অতীত জানার জন্য এই গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিজ্ঞানীরা উৎসাহী। (নাসা)

৯. ●হার্ভাট বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল স্নায়ুবিজ্ঞানী মানুষের মস্তিষ্কের ত্রিমাত্রিক ম্যাপিং করতে সক্ষম হলেন। মৃগী রোগে আক্রান্ত ৪৫ বছরের এক মহিলার মস্তিষ্কের কর্টেক্স অঞ্চলের নমুনা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা প্রতি ঘন মিলিমিটারে প্রায় ৫৭ হাজার স্নায়ুকোষ ও ১৫ লক্ষ সাইন্যাপ্স বা প্রান্তসন্নিকর্ষ-র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন। বিজ্ঞানীরা জানান ঐ ক্ষুদ্র অংশের স্মৃতিধারণ ক্ষমতা প্রায় ১.৪ পেটাবাইট (১ পেটাবাইট=$১০^{১৫}$ বাইট)। (সায়েন্স ডেইলি)

১০. ●মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-র সৌর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা সূর্যের বুকে ধারাবাহিক সৌরঝড় প্রত্যক্ষ করেছেন। যার প্রভাবে পৃথিবীতে খালি চোখে মরুপ্রভা দেখা গেছে যা ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাস অঞ্চল থেকে দৃশ্যমান ছিল। মোটামুটি ১১ বছর অন্তর এরকম সৌরঝড় চক্রাকারে ফিরে আসে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন ইদানীং কালের মধ্যে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের সৌরঝড় ছিল প্রবলতম যা স্থায়ী হয়েছিল প্রায় এক সপ্তাহ। এর প্রভাবে পৃথিবীর ভূচৌম্বকীয় আলোড়ন ঘটেছিল ও কেবলমাত্র মধ্য আমেরিকায় কয়েক লক্ষ মাইল টেলিগ্রাফ তার ধ্বংস হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন বর্তমানে সৌরঝড় সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও প্রযুক্তি এতটাই বিকশিত যে সৌরঝড়ের পূর্বাভাষ দেওয়া ও তার প্রভাবে ভূচৌম্বকীয় আলোড়ন মোকাবিলা করা সম্ভব। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১৫. ●একদল সুইস বিজ্ঞানী কৃত্রিম কোয়ার্জ-এর সাহায্যে সৌরশক্তি শোষণ করে ১০০০° সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আগামীদিনে এই আবিষ্কার জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রতিস্থাপক হিসাবে আবির্ভূত হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। (সায়েন্স ডেইলী)

১৭. ●ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ঘটিয়েছেন। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ২২০×৮০ মাইক্রোমিটার মাত্রার সিলিকন চিপস বানাতে সক্ষম হয়েছেন। এটি এখনও পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম সিলিকন চিপস যা পূর্বের তুলনায় ৫০ গুণ ক্ষুদ্র। (ইউরেকা এলার্ট)

২০. ●জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ থেকে গৃহীত তথ্য থেকে এই প্রথম কোন বহির্গ্রহের কেন্দ্রস্থলের পরিমাপ ও ঘনত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হল। ২০০ আলোকবর্ষ দূরের গ্রহটির ওজন নেপচুনের প্রায় এক-দশমাংশ। এর ফলে বহির্গ্রহগুলির বস্তুগত উপাদানের বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। (সায়েন্স ডেইলি)

২৩. ●অরিগন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারীর ক্যাথোডে কোবাল্ট ও নিকেলের পরিবর্তে

সফলভাবে লোহা ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এর ফলে ঐ ব্যাটারীর বাজার মূল্য ৫০ শতাংশে নেমে আসবে ও কোবাল্ট ও নিকেলের বিষক্রিয়ার হাত থেকে প্রকৃতি মুক্ত হবে। (সায়েন্স অ্যাডভানস)

৩০. ●জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ প্রেরিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা ২৯০ আলোকবর্ষ দূরের এক ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছেন। JADES-GS-z14-0 নামাংকৃত উজ্জ্বল ছায়াপথটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দূরবর্তী চিহ্নিত ছায়াপথ। (নাসা)

জুন ঃ ৪. ●চীনের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা প্রেরিত রোবটিক মহাকাশযান চ্যাং-৬, চাঁদের দূরবর্তী পৃষ্ঠে অবতরণ করে চাঁদের মাটি সংগ্রহ করেছে ও তা পৃথিবীর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। মহাকাশ যানটি প্রায় ২ কেজি নমুনা সংগ্রহ করেছে। পৃথিবীর কোন দেশই এখনো পর্যন্ত চাঁদের ঐ পৃষ্ঠের মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করতে পারেনি। চীনা মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, চ্যাং চন্দ্রাভিযানগুলির উদ্দেশ্যে হল ২০৩০ খ্রিস্টাব্দে চাঁদের মাটিতে মহাকাশচারী পাঠানো। (দ্য গার্ডিয়ান)

৫. ●সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী ASKAP J1935+2148 নামক একটি নিউট্রন তারকার সন্ধান পেয়েছেন যার ঘূর্ণনগতি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম। অতি দানবীয় তারকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট নিউট্রন তারকার জন্ম হয়। মানুষের সন্ধান পাওয়া সর্বোচ্চ ঘূর্ণনগতি সম্পন্ন নিউট্রন তারকার গতি হল প্রতি সেকেন্ডে ৭১৬। ১৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত উল্লিখিত নিউট্রন তারকাটি একটি ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করে প্রতি ৫৪ মিনিটে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করা প্রায় ৩ হাজার নিউট্রন তারকার মধ্যে এটি সবচেয়ে শ্লথগতি সম্পন্ন। (নেচার অ্যাস্ট্রোনমি)

১১. ●মহাকাশের দূরবর্তী অঞ্চলে মানুষ পাঠানো বিজ্ঞানীদের বহুদিনের পরিকল্পনা। দীর্ঘদিন গভীর মহাকাশে কাটানো মানুষের শারীরিক পরিবর্তন কি হতে পারে সেটিও মহাকাশ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব মেডিসিন-এর এক গবেষকদল একটি জার্নালে জানাচ্ছেন, স্পেসফ্লাইটের সঙ্গে কিডনীর সমস্যার সম্পর্ক খুবই প্রবল। বেশ কয়েকটি মানুষ ও ইঁদুরের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। মঙ্গলগ্রহে মানুষ পাঠানোর ক্ষেত্রে এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিজ্ঞানী মহল মনে করছেন। (নেচার কম্যুনিকেশন)

১২. ●মানুষসহ বেশ কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রজাতির গড় আয়ু পুরুষ প্রজাতির তুলনায় সাধারণত বেশি হয়। বর্তমান পৃথিবীতে স্ত্রী প্রজাতির গড় আয়ু পুরুষদের তুলনায় ৫% বেশি। আদিম পৃথিবীতেও স্ত্রী বানর প্রজাতির গড় আয়ু পুরুষ প্রজাতির তুলনায় ছিল বেশি। জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী গবেষণা থেকে প্রাথমিকভাবে জানাচ্ছেন যে এই প্রশ্নের উত্তর ডিম্বানু ও শুক্রাণুর ভিতর নিহিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এখুনি নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও আগামী গবেষণা এর উত্তর দেবে। (দ্য গার্ডিয়ান)

●বর্তমানে চীন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুপারপাওয়ার তকমা পেয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক উদ্ভাবন চীনকে এই শিরোপায় ভূষিত হয়েছে তা বিভিন্ন মহল মেনে নিয়েছে। বলা হয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূ-বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চীন এখন বিশ্বের এক নম্বরে হলেও সাধারণ জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমেরিকা ও ইউরোপ এখনো আগুয়ান। (দ্য ইকনোমিস্ট)

●আইবেরিয়ান লিনক্স নামক এক বিড়াল প্রজাতিকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে বিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত করেছিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার। ঐ সময় পৃথিবীতে এদের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৬২, কিন্তু ২০২১ খ্রিস্টাব্দের গণনায় এদের সংখ্যা ৬৪৮ হয়ে যাওয়ায় বিপন্ন তকমা তুলে নিল ঐ সংস্থা। (বিবিসি নিউজ)

২৫. ●চীনের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা প্রেরিত রোবটিক মহাকাশযান চ্যাং-৬, চাঁদের দূরবর্তী পৃষ্ঠ থেকে প্রস্তর ও চাঁদের মাটির নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করল। এই অভিযান শুরু হয় এ বছর ৩রা মে। ৫৩ দিনের এই অভিযান সফল, জানালেন চীনা মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন ঐ নমুনায় চাঁদের মাটিতে অতীতের উল্কাপাতের অবশিষ্টাংশ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। চীনা বিজ্ঞানীরা আরও জানাচ্ছেন যে গবেষণার জন্য ঐ নমুনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিতরন করা হবে। (দ্য গার্ডিয়ান)

জুলাই ঃ ২. ●মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আকাশগঙ্গা ছায়াপথের দুটি উপছায়াপথ আবিষ্কার করেছেন। Sextans II ও Virgo III নামের উপছায়াপথ দুটির অস্তিত্ব বিজ্ঞানীদের জানা থাকলেও এইবার তা চিহ্নিত করা গেল। এই আবিষ্কার মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। (স্পেস ডট কম)

৫. ●টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ সায়েন্স সেন্টারের বিজ্ঞানীরা মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও বিশদভাবে জানতে একটি অভিনব গবেষণা শুরু করেছেন। রোগ প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের অন্ত্রে অবস্থিত অণুজীব ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করিয়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে ইঁদুরগুলি কিছু কিছু রোগের অ্যান্টিবডি তৈরী করতে সক্ষম হচ্ছে। এই গবেষণা রোগপ্রতিরোধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। (ইউ টি হেলথ)

৯. ●ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে Pilosocereus millspaughii নামক একটি ক্যাক্টাস প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। আঞ্চলিকভাবে এমন বিলুপ্তির ঘটনা এর আগে কখনো লক্ষ্য করা যায়নি বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। (ফ্লোরিডা মিউজিয়াম)

●*শেষাংশ ৩২ পৃষ্ঠায়* ➔

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

পরিবেশ বান্ধব বিকল্প অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ
জল অন্ত্যেষ্টি বা ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস

– পঞ্চানন মন্ডল

২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি একটি খবর বিশ্বের অনেকের নজর কেড়েছিল। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিতে নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্ব **ডেসমন্ড টুটু**-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক পরিবেশ বান্ধব বিকল্প পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। ৯০ বছর বয়সে ডেসমন্ড টুটু মারা যান। মারা যাওয়ার আগে তিনি তাঁর অনুগামীদের বলে যান তাঁর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান যেন অনাড়ম্বর কোনো পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে করা হয়। টুটু জলবায়ু পরিবর্তনকে **"আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি"** বলে মনে করতেন। বর্ণবাদ বিরোধী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব টুটু'র ইচ্ছানুসারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এক পরিবেশ বান্ধব বিকল্প শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইজন্য **বায়ো-রেসপন্স সলিউশন** এর সহ পরিচালক এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, কারণ তারাই **ওয়াটার ক্রিমেশন বা ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস মেশিনের বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা। তাঁরা জল অন্ত্যেষ্টি (Water Cremation/Aquamation) বা জৈব অন্ত্যেষ্টি (Organic Cremation) বা ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস (Alkaline Hydrolysis)** পদ্ধতিতে ডেসমন্ড টুটু'র শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

সাম্প্রতিক কয়েক বছর এই বৈপ্লবিক বিকল্প পদ্ধতি চিরায়ত ঐতিহ্যবাহী মৃতদেহ সৎকারের প্রথাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছে। চিরায়ত শবদেহ দাহ করা বা কবর দেওয়ার পরিবর্তে এই পরিবেশ-বান্ধন বিকল্পটি মানুষের দেহাবশেষের অন্ত্যেষ্টির জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ও টেঁকসই পদ্ধতি বলে অনেকে দাবি করছেন।

জল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস কি?

জল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের দেহাবশেষকে জীবাণুমুক্ত তরলে পরিণত করতে আগুনের পরিবর্তে ক্ষারীয় জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিসের সময়, মৃতদেহ বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি বড় স্টেইনলেস-স্টীল চেম্বারে প্রবেশ করানো হয়। এর মধ্যে তরল হিসাবে ক্ষারীয় দ্রবণ নেওয়া হয়, যাতে ৯৫ শতাংশ জল এবং ৫ শতাংশ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH) থাকে। দ্রবণটিকে উত্তপ্ত করার ব্যবস্থা থাকে। মোটামুটি ১০০°C এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় সাধারণ বায়ুমন্ডলীয় চাপে ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিসে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টার মধ্যে শবদেহ ক্ষয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি যখন কিছুটা উচ্চ তাপমাত্রায় মোটামুটি ১৫০°C তাপমাত্রায় ঘটানো হয় তখন বদ্ধ স্টিলের চেম্বারে আরও চাপ তৈরি হয়, ফলে ৪ থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে শবদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাপ এবং চাপ পচনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

এই প্রক্রিয়ায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে উত্তপ্ত ক্ষারীয় দ্রবণ শবদেহের নরম কলাকোষগুলিকে দ্রবীভূত করে আর শুধুমাত্র হাড়গুলিকে কিছুটা অক্ষত রাখে। ফলস্বরূপ এই তরল, যাকে সাধারণত **"বায়ো-ক্রিমেশন ফ্লুয়েন্টস"** বলা হয়, তা মূলত অ্যামাইনো অ্যাসিড, পেপটাইড, শর্করা এবং লবণ সমৃদ্ধ একটি জীবাণুমুক্ত তরল সংমিশ্রণ। ক্ষয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এই তরল নির্গমন নলের মাধ্যে কল খুলে বের করা হয়। এই তরল মিশ্রণকে কিছু প্রক্রিয়াকরণের পর পুনঃব্যবহার করা যায়। এরপর স্টিলের চেম্বারে থাকা দেহের হাড়ের অবশিষ্টাংশকে বের করে বিশেষ প্রক্রিয়ার পাউডারে পরিণত করা হয়। সেই পাউডার ছাই হিসাবে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় পরিজনদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়। ঠিক যেমন শবদাহ করার পরে দেহাবশেষ ছাই হিসাবে মৃতের পরিবারকে ফেরত দেওয়া হয়।

ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস আবিষ্কার

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর এক ইংরেজ গবেষক **অ্যামোস হার্বার্ট হবসন** একটি মার্কিন পেটেন্ট পান। হবসন আবিষ্কার করেছিলেন যে কোনো প্রাণীর দেহাবশেষ কোনো ক্ষার, যেমন কস্টিক পটাশের ঘন দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। আট থেকে দশ ঘন্টার জন্য ঘন এই সংমিশ্রণটিকে গরম করে এবং নাড়া দিলে জেলাটিন বা আঠার মতো জিনিস তৈরি হয়। একে তিনি সার তৈরি করার একটি দুর্দান্ত উপায় বলে উল্লেখ করেছিলেন। হবসনের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি কৃষকদের জন্য একটি আশীর্বাদ ছিল কিন্তু সমসাময়িক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালকদের জন্য এটা তখনও এক অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার ছিল।

এই আবিষ্কারের প্রায় এক শতাব্দী পরে, অ্যালবানি মেডিক্যাল কলেজের সহকর্মী **গর্ডন আই কায়ে** এবং **পিটার বি ওয়েবার** ল্যাবে ব্যবহৃত প্রাণীদের অন্ত্যেটির সমস্যা সমাধানের জন্য হবসনের কৌশলটি পুনর্বিবেচনা করেন। তারা মনে করেন যে ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়াকরণ এবং গবেষণার বিষয় হিসাবে ব্যবহৃত প্রাণীদের নিরাপদ নিস্পত্তিতে সহায়তা করতে পারে। এই ব্যাপারে গবেষণা করে তারা যখন সফল হন। তারা (১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে)

পেটেন্টের জন্য আবেদন করলে পেটেন্ট পান। এরপর উদ্ভাবকরা তাদের প্রকৌশল বাস্তবায়নের জন্য মেশিন তৈরি করতে শুরু করেন। তাঁরা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে অ্যালবানি মেডিক্যাল কলেজে প্রথম একটি মেশিন ইনস্টল করেছিলেন, এটি তখন হাসপাতালে **'টিস্যু ডাইজেস্টার'** নামে পরিচিত ছিল। এরপর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যান্ডস হাসপাতালে চিকিৎসা গবেষণার জন্য দান করা মানব দেহাবশেষ প্রক্রিয়াকরণের জন্য তারা তাদের প্রথম সিস্টেম বিক্রি করেছিলেন। তখনও লোকে একে টিস্যু ডাইজেস্টার বলত, মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় নি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংস্থাগুলো কবে থেকে মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করল

২০১০ খ্রিস্টাব্দে, **বায়ো-রেসপন্স সলিউশন** ওহিওর একজন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালক **জেফ এডওয়ার্ডস** কাছ থেকে একটি অর্ডার পায়। এডওয়ার্ডস ২০১১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তার গ্রাহকদের জন্য ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস পরিষেবা দেওয়া শুরু করেন। তারপর থেকে, **রিসোমেশন লিমিটেড** এবং **বায়ো-রেসপন্স সলিউশন** মানুষের দেহাবশেষের নিষ্পত্তির জন্য সমস্ত রকম মেশিন তৈরি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এরা এখন পর্যন্ত ৬০টিরও বেশি মেশিন তৈরি করেছে, যাদের মোট ৮৬টি মেশিন এই বছরের শেষ নাগাদ চালু হওয়ার আশা করা হচ্ছে। এডওয়ার্ডস আসলে সেই লোক যার পারিবারিক ব্যবসা, **পিয়ারসন'স ফিউনারেল হোম**, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ওরেগনে ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস প্রদান করেছে। এডওয়ার্ডস ১৯টির মতো জল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, প্রশাসন তাকে ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুমতি দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এডওয়ার্ডস আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন, যুক্তি দেখান যে তিনি তার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন কারণ কোন আইন এটি নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু বিচারক তার মামলা এক বছর পরে খারিজ করে দেন, রায় দেন যে পুর প্রশাসন ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালকদের ওহিওতে ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস দ্বারা মানুষের দেহাবশেষ নিষ্পত্তি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এডওয়ার্ডসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংস্থা এখনও এটিকে বিকল্প অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হিসাবে মনে করে, তাই তারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্য মৃতদেহকে মিসৌরিতে নিয়ে যায়।

যদিও গবেষণায় অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছিল যে ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে উৎপাদিত তরল বর্জ্য পৌসভার নর্দমা ব্যবস্থায় ফেলা নিরাপদ। তবুও বহু পুরসংস্থা এই বর্জ্য নর্দমাতে ফেলার অনুমতি দেয়নি। তাই এই বর্জ্য নিষ্পত্তি জল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংস্থার কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তাই তারা উৎপন্ন বর্জ্য **বায়ো-ক্রিমেশন ফ্লুয়েন্টস** এর পুনঃব্যবহার করার দিকে জোর দেন।

পরিবেশগত সুবিধা

জল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে ঐতিহ্যবাহী শবদাহ এবং কবরের তুলনায় বেশ কিছু পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করে ঃ

কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস ঃ চিরাচরিত শব দাহকার্য, যা বিভিন্ন যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করে, জল অন্ত্যেষ্টিতে ন্যূনতম কার্বন নির্গমন ঘটায়। প্রক্রিয়াটি খুবই শক্তিশালী এবং বায়ু দূষণ ন্যূনতম।

জল সংরক্ষণ ঃ জল অন্ত্যেষ্টি শবদেহের সৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় জলের অতি সামান্য ভগ্নাংশ ব্যবহার করে, যা জলের অভাবের সম্মুখীন অঞ্চলগুলিতে একে আরও টেকসই বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরন্তু, প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত জলকে পুনর্ব্যবহার করে বর্জ্য এবং পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে দেয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ঃ শবদাহ কার্যের কাঠের ব্যবহার এবং কবরের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান এড়িয়ে জল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা কমায়। দাহকার্য বা কবর নিয়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ে চিন্তিতদের জন্য আরও এক পরিবেশ বান্ধব বিকল্প।

নিরপেক্ষ pH ঃ ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ার ফলে একটি নিরপেক্ষ pH দ্রবণ তৈরি হয় যা নিরাপদে পরিবেশে ফিরে আসতে পারে বা সেচের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ঐতিহ্যগত শবদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত মাটি দূষণের সম্ভাবনা এড়ানো যায়।

ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা

বর্তমানে অনেক পরিবার এই বিকল্প ব্যবস্থা বেছে নিচ্ছে। নতুন বিকল্পটি পছন্দ করছেন তার কারণ তার প্রিয়জনকে আগুনে দাহ করতে হচ্ছে না। তাছাড়া মৃতের পরিবার প্রিয়জনের চিতাভস্ম ফেরত পেতে পছন্দ করে। এখানেও তা পেতে পারছে। তারা মনে করছে যে এটি শবদাহ ভিত্তিক শ্মশানের চেয়ে আরও সহজ সুন্দর এক বিকল্প। **সর্বোপরি এটা তাদের কাছে এক পরিবেশ বান্ধব বিকল্প।**

তাই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জল অন্ত্যেষ্টি পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিদের মধ্যে, বিশেষ করে যারা জীবনাবসানের পর তাদের মৃতদেহের নিষ্পত্তির একটি ভালো বিকল্প খুঁজছেন তাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। যদিও অনুশীলনটি এখনও তুলনামূলকভাবে নতুন, এটি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমানভাবে কোথাও বৈধ হচ্ছে আবার কোথাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বেশ কয়েকটি রাজ্য জল অন্ত্যেষ্টিকে বৈধ ঘোষণা করেছে। এই বিকল্প ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য আইন আনা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার সমর্থকরা এর পরিবেশগত সুবিধা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং টেকসই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুশীলনের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে এর গ্রহণযোগ্যতার নেপথ্যে চালিকা শক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

➔

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

তামার পাত্রে জল পান করা বা খাবার খাওয়া কতটা স্বাস্থ্যসম্মত?

আয়ুর্বেদ মতে তামার পাত্রে খাবার বা জল খেয়ে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি দোষ দূরে থাকে। তাই বহুকাল আগে থেকে তামার পাত্রে জল খাওয়ার চল আছে। কিন্তু সত্যি কি তাই? তামার পাত্রে জল রাখা বা পান করার সত্যি কি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা বলছে তামার পাত্রে অনেকক্ষণ জল রাখলে তা থেকে সামান্য তামার আয়ন জলে মিশতে পারে। এমনিতেই আমাদের পুষ্টিতে ট্রেস উপাদান হিসাবে তামার কিছু উপকারী ভূমিকা আছে। কিন্তু বেশি মাত্রায় তামা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে গৃহীত হলে কপার টক্সিসিটি তৈরি করতে পারে।

শরীরে প্রতিটি খনিজেরই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় চাহিদা রয়েছে। তবে নিয়মিত চাহিদার তুলনায় বেশি পরিমাণে কোনও খনিজ দেহে প্রবেশ করলে সেক্ষেত্রে কিন্তু স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তামার পাত্রে সারারাত জল রেখে সকালে উঠে সেই জল খেলেও কিন্তু একই ধরনের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত তামা দেহে প্রবেশ করার কারণে কপার টক্সিসিটি তৈরি হয়। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, সারাদিনে ১০ মিলিগ্রামের বেশি তামা দেহে প্রবেশ করলেই একাধিক জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেদিক থেকে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

সারারাত তামার পাত্রে জল রেখে সকালে উঠে খেয়ে লিভারের মারাত্মক রোগ লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকী এই পদ্ধতিতে জলপান করে গ্রেড থ্রি ফ্যাটি লিভারেও কেউ আক্রান্ত হতে পারেন। তাই লিভারকে সুস্থ রাখতে চাইলে তামার পাত্রে সারারাত রাখা জল পান করা চলবে না।

এমনিতেই গত কয়েক দশকে ক্রনিক কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হু হু করে বেড়েছে। এর মূল কারণ হলো ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনশন। এই দুই অসুখের সাঁড়াশি আক্রমণে কিডনি বা বৃক্কের হাল বেহাল হতে সময় লাগে না। তবে শুধু দুই অসুখ নয়, শরীরে অত্যধিক পরিমাণে তামা জমা হলেও কিডনির ক্ষতি হতে পারে। তাই কিডনির ভয়াবহ অসুখের ফাঁদ থেকে বাঁচতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই তামার পাত্রে জল রাখার অভ্যাস ছাড়তে হবে।

মনে রাখতে হবে তামা, দস্তা, লোহা বা অন্যান্য খনিজ যা দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় তা আমরা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য থেকেই পাই। এর জন্য তামা, দস্তা, লোহার পাত্রে জল বা খাবার খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো সব বিজ্ঞাপনী চমক। আয়ুর্বেদের হাত ধরে ব্যবসায়ীদের সাধারণ মানুষের পয়সা লুটের নব নব কৌশল। বিভিন্ন ওয়াটার পিউরিফাই মেশিন কোম্পানি তাদের মেশিনে কপার পাত্র লাগিয়ে তা চড়া দামে বিক্রি করছে। সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে মুনাফা লুটছে।

নিয়মিত শাকসবজি, ডাল, ফল-মূল, মাছ-মাংস, ডিম, দুধ পরিমিত আহার করলে দেহের প্রয়োজনীয় সব খনিজ উপাদান পাওয়া যায়। তবুও কোনো কারণে রোগব্যাধি হলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা গেল যে শরীরে কোনো খনিজের ঘাটতি আছে তখন ডাক্তারের পরামর্শ মতো কয়েকদিন ওষুধ খান। প্রয়োজনে তামা বেশি আছে এমন খাবার যেমন ছোলা, বাদাম, মাশরুম, গলদা চিংড়ি, যকৃৎ, সবুজ শাকসবজি, ডার্ক চকোলেট খান। তামার পাত্রে জল বা খাবার খাওয়া লাগবে না।

তামার বোতল নয়, প্লাস্টিক বোতল নয়, জল খাওয়ার সবচেয়ে ভালো পাত্র হলো কাচের বোতল, কাচের গ্লাস বা উন্নত মানের স্টিলের বোতল বা গ্লাস। সুস্থ থাকতে কাচের বা স্টিলের পাত্রে জল রাখুন বা পাত্রে জলপান করুন। এতেই সুস্থ থাকবে শরীর। শুধু তাই নয় বিভিন্ন জটিল অসুখ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।■

● *জল অন্ত্যেষ্টি বা ক্ষারীয় হাইড্রোলাইসিস*

যেহেতু বর্তমান সমাজ ঐতিহ্যবাহী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুশীলনের পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতন হয়ে উঠছে তাই জল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতো পরিবেশবান্ধব বিকল্পগুলি জীবনের শেষের যত্নের জন্য একটি টেকসই সমাধান হতে চলেছে। ন্যূনতম কার্বন ফুটপ্রিন্ট, জল সংরক্ষণের সুবিধা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সাথে এই উদ্ভাবনী পদ্ধতিটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শিল্পকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

বর্তমানে জল অন্ত্যেষ্টি বিশ্বের মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তবুও এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা পরিবেশগতভাবে টেকসই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুশীলনের জন্য এটি এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিশা দেখাচ্ছে। **যেহেতু সমাজ ও পরিবেশ সচেতন মানুষ সবসময় পরিবেশ বান্ধব বিকল্প খোঁজে সেক্ষেত্রে জল অন্ত্যেষ্টি পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে মৃত ব্যক্তিদের সম্মান জানানোর জন্য এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত উপায় হতে পারে।**■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব দশম অংশ)

বিগত সংখ্যায় পর্যায় সারণীর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে গিয়ে অতিপারমাণবিক কণা (অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ স্থায়ী কণা) গুলির মধ্যে দুটির (ইলেকট্রন ও প্রোটন) আবিষ্কারের কাহিনী জেনেছি। নব আবিষ্কৃত কণাগুলির ভর, তাদের আধান বা চার্জ, পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জেনেছি পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে। একেই পরমাণুর 'মডেল' বলা হয়েছে। সঠিক অর্থেই একে 'মডেল' বলা হয়, কারণ সম্যক জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত এগুলির কোনোটিই পরমাণুর চাক্ষুস বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রাপ্ত ছিল নয়। ফলতঃ এই মডেলেরও পরিবর্তন হয়েছে এবং আগামীতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, যদি অতিপারমাণবিক কণাগুলির ধর্ম-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুন কিছু চোখে পড়ে। অতিক্ষুদ্র বস্তুজগতেও এভাবে মানব ধারণারও পরিবর্তন হয়ে চলে।

পরমাণুর রাদারফোর্ড মডেলের পরিবর্তন আনেন বিজ্ঞানী নিলস্ বোর। তাঁর নতুন পরমাণুর মডেল শুধু নতুন ছিল না। এটা গড়ে ওঠার পিছনে কাজ করেছে পদার্থ বিজ্ঞানের এক নতুন ধারা 'কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞান'। এর সূত্রপাত হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। এই পরীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ ফল সম্পর্কে আলোচনার আগে এই কৃষ্ণ বস্তু কি তা জানা যাক। এই কৃষ্ণ বা কালো বস্তু হল এমন একটি কালো প্রকোষ্ঠ যা শক্তিকে শুষে নেয় এবং তা একটা সময়ের পর নিঃসরণ ঘটায়। আগেকার ধারণা অনুযায়ী এই শক্তিনিঃসরণ হওয়ার কথা ছিল নিরবিচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু প্লাঙ্কের পরীক্ষালব্ধ ফল ছিল এমন যা শক্তির নিরবিচ্ছিন্ন নিঃসরণের গাণিতিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। প্রাপ্ত তথ্যকে গাণিতিক প্রকাশের সঙ্গে মেলানো সম্ভব হয়, যদি শক্তি নিঃসরণকে নিরবিচ্ছিন্ন না ধরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেটের আকারে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তির নিঃসরণকে যদি মান্যতা দেওয়া হয়। এই বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন প্যাকেটের (বোঝার সুবিধার্থে এমন কল্পনা করা হচ্ছে) শক্তি হবে একটি নির্দিষ্ট ধ্রুবক (h) এবং তার কম্পাঙ্কের গুণফল। আরো পাঁচ বছর পর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট শক্তির কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বিকশিত করলো। তিনিও দেখালেন কোনো ধাতুর উপর আলো অর্থাৎ শক্তি অবিরত ধারায় পরে না, তা এসে পড়ে ভাগে ভাগে। এই ভাগে ভাগে এসে পড়া শক্তি এক একটা প্যাকেটের মতো, এই প্যাকেটগুলিকে বলে ফোটন। যার শক্তির পরিমাণ ঐ প্লাঙ্কের নামাঙ্কিত নির্দিষ্ট ধ্রুবক (h) এবং তার কম্পাঙ্কের গুণফল।

এইভাবে ম্যাক্স প্লাঙ্কের কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের গাণিতিক প্রকাশ আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হল। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রন শক্তি গ্রহণ করে নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী কক্ষপথ থেকে দূরবর্তী কক্ষপথে যখন যায় তখন তা কীভাবে ঘটে।

পরমাণুর অভ্যন্তরে রাদারফোর্ডের মডেল অনুযায়ী অতিক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রনগুলি দ্বিমাত্রিক বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান জানা ছিল। এমন কি এক একটা পরমাণুতে ইরেকট্রনের বিন্যাস কেমন হবে, সেটা নিয়েও চর্চা শুরু হয়ে গেছিল। এই ধারণাকে সূত্রবদ্ধ করেন জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী রিচার্ড অ্যাবেগ (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে)। তিনি দেখান নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলিতে আছে এমন এক ইলেকট্রন বিন্যাস, যার কারণে এর কোন কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে অন্য পরমাণুর কক্ষপথে যেতে পারে না বা তার বিপরীত ঘটনা হয় না। এর নাম অষ্টক নিয়ম বা অক্টেট রুল। এই নিয়মানুসারে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি ছাড়া তাদের নিকটতম পরমাণুগুলি যতক্ষণ না সর্ব বহিঃস্থ কক্ষের ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করে ঐ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ না করছে (এর জন্য ন্যূনতম শক্তির প্রয়োজন) ততক্ষণ থামে না। এই ন্যূনতম শক্তির দ্বারা নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস পেতে গেলে অন্য পরমাণুগুলির ইলেকট্রন বিন্যাস যা হওয়ার দরকার, সেটাই হবে সেই সেই পরমাণুর ইরেকট্রন বিন্যাস (ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন) নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির সবথেকে বাইরের কক্ষপথে আটটি করে ইলেকট্রনের ধারণা থেকেই অক্টেট নামকরণ। যদি আর্গন (Ar) নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পারমাণবিক সংখ্যা ১৮ হয়, তবে তার নিস্তরিৎ অবস্থায় ইলেকট্রন সংখ্যাও ১৮ হবে। সব থেকে বাইরের কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন থাকলে তার ইলেকট্রন বিন্যাস হয় – ২,৮,৯। এখন

যে পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১৭ হবে (অর্থাৎ ক্লোরিনCl), তার ইলেকট্রন বিন্যাস হবে – ২,৮,৭ (এক্ষেত্রে মাত্র একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে যে Ar এর মতো ইলেকট্রন বিন্যাস পাবে। সে ৭টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিয়ন (Ne) নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করবে না। কারণ সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ অনেক বেশি)। একই নিয়মে পটাশিয়াম (K) যার পারমাণবিক সংখ্যা ১৯, তার ইলেকট্রন বিন্যাস হবে – ২,৮,৮। (এক্ষেত্রে তার সব থেকে বাইরের কক্ষপথ থেকে মাত্র একটি ইলেকট্রন ত্যাগ হয়ে অষ্টক নীতি মানলেই চলবে) স্বাভাবিকভাবে ১৭,১৮,১৯ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট পরমাণুগুলি ছাড়াও অন্যান্য নিকটবর্তী মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নির্ণয় সম্ভব। যেমন সালফার (S) এর পারমাণবিক সংখ্যা ১৬, তার ইলেকট্রন বিন্যাস – ২,৮,৬। ক্যালশিয়ামের (পারমাণবিক সংখ্যা ২০), তার ইলেকট্রন বিন্যাস হবে – ২,৮,৮,২।

রিচার্ড অ্যাবেগ এর মতো ধারণার ভিত্তিতে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের দুজন রসায়ন বিজ্ঞানী গিলবার্ট নিউটন লিউইস এবং ইরভিঙ্গ ল্যাঙ্গমুইর মৌলিক ও যৌগিক অণুর গঠন চিত্র তৈরি করেন। একে সংক্ষেপে বলে লিউইস স্ট্রাকচার বা কাঠামো। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী কেকুলের দ্বারা জৈব যৌগের গঠন কাঠামোর ধারণার বিকাশ হয়। অধাতুগুলির যৌগে কীভাবে ইলেকট্রন শেয়ার করে বন্ধন হয়, সেই ধারণার ভিত্তিতে সমযোজ্যতার ধারণার সূত্রপাত হয়। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে আসবো। আপাতত বিজ্ঞানী নিলস্ বোরের নতুন পরমাণুর মডেল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বোরের এই পরমাণুর মডেল আমরা পাই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে।

নিলস্ বোরের এই স্বীকার্য কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের অ্যাকাডেমি অফ সাইন্সের দ্বারা প্রকাশিত একমাত্র কোয়ান্টাম মেকানিকস্ সংক্রান্ত বই 'ফান্ডামেন্টালস অফ কোয়ান্টাম মেকানিকস্' (লে. ভি. এ. ফক.) -এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুরু হচ্ছে এইভাবে – 'An important step towards the creation of present-day quantum mechanics was Bohr's postulation of two principles characteriging the properties of atomic systems.' অর্থাৎ বর্তমানের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বোরের স্বীকার্য হল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর যে দুটি নীতির উপর বিশেষ জোড় দিয়েছেন লেখক সে প্রসঙ্গে ঢোকার আগে সংক্ষেপে বোরের স্বীকার্য ও তদনুসারে পরমাণুর মডেলের ধারণা দেওয়া যাক।

যে সমস্যার সমাধানকল্পে এই পরমাণু মডেল ও স্বীকার্য (postulate) সেই প্রসঙ্গে এবার প্রবেশ করা যাক। ইংরেজ বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব অনুসারে যখন কোনো আধান বা চার্জ সম্পন্ন বস্তুর বেগের পরিবর্তন হয়, তখন তার শক্তি হ্রাস পেতে থাকবে। এই কথা মাতায় রেখে বলা যায় রাদারফোর্ডের মডেল অনুসারে ক্রমাগত বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়নাম ইলেকট্রনের যেহেতু প্রতিমুহূর্তে দিক পরিবর্তন হবে, তাই তার প্রতিমুহূর্তে বেগের পরিবর্তন হয়ে চলবে। ফলতঃ তার শক্তি হ্রাস পাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে। এই নিরবিচ্ছিন্ন শক্তি হ্রাসের ভাবনা কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যানুসারে নয়। ফলে ক্রমশ শক্তির হ্রাস হলে সেই ইলেকট্রন কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত না হয়ে ক্রমহ্রাসমান ব্যাসার্ধে সর্পিল আকারের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ধনাত্মক আধান সম্পন্ন কেন্দ্রে গিয়ে পড়বে। অর্থাৎ ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে রাদারফোর্ড মডেল কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি ইলেকট্রন আধান সম্পন্ন কণা এবং ঐ মডেল অনুসারে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান। যেহেতু বোরের স্বীকার্য ও মডেল এই সমস্যার সমাধান চেয়েছিল, সেই কারণে একরকম জোড় করে এই মডেল কতগুলি ধারণার অবতারণা করলো।

এখানে বলা হল নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রনগুলি বৃত্তাকার পথে ঘোরে, তবু তারা কখনো শক্তি হারায় না। একে নির্দিষ্ট শক্তিস্তর (energy state) বলে। যাকে অন্য পরিভাষায় অরবিট বা শেল বলা হয়। অরবিটগুলি $n = 1, 2, 3$ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা (যা পরবর্তীতে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা নামে পরিচিত হয়েছে) বা K, L, M ইত্যাদি অক্ষরে প্রকাশ করা হল। অরবিট অনুসারে উপস্থিত সর্বোচ্চ ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের ফর্মুলা $2n^2$ হলেও অষ্টক সূত্র মেনে চলতে হবে। ফলে ইতিমধ্যে ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে পূর্ব ধারণাই থাকলো।

বোরের প্রকল্প অনুসারে প্রতিটি অরবিটের ব্যাসার্ধ নির্দিষ্ট, তার সাধারণ সূত্র

$$\gamma n = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 me^2}, \frac{1}{z}$$ [এখানে $n =$ মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা, $h =$ প্লাঙ্ক ধ্রুবক, $m =$ ইলেকটনের ভর $e =$ ইলেকট্রনের চার্জ, $z =$ পারমাণবিক সংখ্যা]

এই ব্যাসার্ধ অতিক্ষুদ্র $\overset{o}{A}$ (অ্যামস্ট্রং) নামক দৈর্ঘ্যের এককে মাপা হয় যেখানে $1\overset{o}{A} = 10^{-10}$ মিটার $= 0.1$ ন্যানোমিটার আবার এই প্রকল্প অনুসারে প্রতিটি অরবিটে উপস্থিত

ইলেকট্রনের দ্রুতি (speed) স্থির [সাধারণ সূত্র $Ve = 2.186 \times 10^6 \frac{z}{n}$]

এই প্রকল্প অনুসারে প্রতিটি অরবিটে উপস্থিত ইলেকট্রনের মোট শক্তি (তার গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির যোগফল) স্থির। এর সাধারণ সূত্র $E_T = -13.6.\frac{z^2}{n^2}$ ইলেকট্রন ভোল্ট

বাইরে থেকে শক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণই পারে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটাতে। সেক্ষেত্রে দুই শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের মোট শক্তির পার্থক্যের কম পরিমাণ শক্তি এই স্থানান্তর ঘটাতে পারবে না। অর্থাৎ শক্তি এখানে কোয়ান্টাইজড। এই বাহ্যিক শক্তির কারণে ইলেকট্রনের নিম্নতর ব্যাসার্ধ থেকে উচ্চতর ব্যাসার্ধে স্থানান্তরের পর ঐ শক্তির উৎসকে সরিয়ে নিলে ইলেকট্রনগুলি পুনরায় উচ্চতর ব্যাসার্ধের অরবিট থেকে নিম্নতর ব্যাসাধের অরবিটে ফিরে আসবে। এইসময় যে নির্দিষ্ট কোয়ান্টাইজড শক্তি গ্রহণ করে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটেছিল, সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হবে।

যদিও বলেছিলাম মডেলটি একরকম জোড় করে বানানো, তবু হাইড্রোজেনের বর্ণালীর লিম্যান সিরিজের একাংশ ও বামার সিরিজে যে বর্ণালী ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেছিল তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ ছিল। এমনকি লিম্যান সিরিজ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে যে সম্পূর্ণ অতিবেগুনি আলোর বর্ণালী দিয়েছিল, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্যাসেন সিরিজ যে অবলোহিত আলোর বর্ণালী দিয়েছিল, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া অতি অবলোহিত আলোর ব্র্যাকেট সিরিজ, ফুন্ড সিরিজ, হামফ্রিস সিরিজ – সবকটি এই স্বীকার্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। কতগুলি আয়ন $\left(He^+, Li^{2+}, Be^{3+}\right)$ এর বর্ণালীও সংগতিপূর্ণ হয়েছে। কারণ প্রতিক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান ইলেকট্রন উপস্থিত।

বোরের স্বীকার্য ও মডেল ত্রুটিপূর্ণ থাকায় অন্যান্য পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে নি। এই মডেল রাদারফোর্ডের মডেলের মতোই দ্বিমাত্রিক এবং এখানেও ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলির বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। যদিও বাস্তবিক পরমাণু ত্রিমাত্রিক। এছাড়া কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আরো অগ্রগতি যে ধারণাগুলির জন্ম দিয়েছিল (যেমন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাসূত্র, ইলেকট্রনের মত অতিপারমাণিবক কণাগুলির তরঙ্গধর্ম) সেগুলি বোরের প্রকল্প

ও মডেলকে খারিজ করেছে।

তবু মনে রাখার বিষয় পরমাণুর গঠন সম্পর্কে মানব ধারণা ডেমোক্রিটাস বা কণাদ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এসেছে। তাই এক ধারণা পরবর্তী ধারণার সঙ্গে যেমন বিভিন্ন হয়েছে, তেমনি মিলও থেকেছে। উদাহরণস্বরূপ রাদারফোর্ডের মডেল দ্বিমাত্রিক ও অরবিট বৃত্তাকার, আবার বোরের মডেলও তাই থাকলো। কিন্তু কিছু মৌলের ও আয়নের ক্ষেত্রে আবর্তমান ইলেকট্রনগুলির ব্যাসার্ধ, দ্রুতি, শক্তির পরিমাণ নির্ণয় সম্ভব হল। সব থেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল রাদারফোর্ডের মডেল শক্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্পর্কে চর্চা অন্তর্ভুক্ত করে নি। কোয়ান্টাইজড্ আকারে ভাগে ভাগে শক্তির গ্রহণ ও বর্জন বোরের মডেলকে স্বতন্ত্র করেছে।

নিলস্ বোরের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণত সফল না হলেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে পরবর্তীকালে যে কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলির ব্যবহার করে ইলেকট্রন বিন্যাস ধারণা আমরা পেয়েছি, তার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল বোরের স্বীকার্য। ফলে আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণী যা আমরা বর্তমানে ব্যবহার করে থাকি আধুনিক ইলেকট্রন বিন্যাসের তত্ত্বের দ্বারা, তার সূচনা ঘটিয়েছিল বোরের প্রকল্প।

শক্তির যে ফোটন ধারণা এই স্বীকার্যের ভিত্তি সেই ফোটনের শক্তির পরিমাণকে প্লাঙ্ক ধ্রুবক ও তার কম্পাঙ্কের গুণফল দিয়ে প্রকাশিত করে শক্তির কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্মকে একীভূত করা হয়েছিল। অথচ এই দুই বিপরীতকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরিমাণ ও গুণের পারস্পরিক রূপান্তরের উদাহরণ ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি। শক্তির ফোটন ধারণা এবার দুই বিপরীতের অবিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরলো। (ক্রমশ)

সমাজ দর্পণ ঃ

শ্রমজীবী মানুষের জীবন মানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষা!

[অন্যান্য সব দেশের মত এদেশেও সমাজের সকলের জন্য যাঁরা কাজ করেন, আমাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, প্রয়োজনীয় সবকিছু উৎপাদন করেন, পরিসেবা দান করেন, তাঁরা কেমন আছেন? আধপেটা খেয়ে অপুষ্টি নিয়ে পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে বাঁচাকে তো তাঁরা ভবিতব্য মনে করেন। কিন্তু তাঁরাও বাঁচতে চান! বাঁচতে কে না চায়। কিন্তু কাজ শেষে সকলের বাড়ি ফেরা হয় না।

ভারত সরকারের প্রদেয় তথ্য অনুসারে ভারতের কলকারখানায় প্রতিদিন কর্মরত অবস্থায় অন্তত ৩ জন মানুষ মৌলিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাবে মারা যান। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং শ্রমিকদের মধ্যে কর্মরত অসরকারি সংস্থাগুলির মতে এই সংখ্যা অনেক বেশি। কারণ বহু তথ্য রিপোর্টে আসে না। অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা এবং কৃষি মজুররা নথিভুক্ত নন। বিগত সংখ্যা জুন ২০২৪-এ জনজীবনের পরিবেশ কলমে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল। এই সংখ্যা থেকে এই কলমে ধারাবাহিকভাবে এই খবরগুলি তুলে ধরা হবে। – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

তামিলনাড়ুর শিবকাশীর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ১০ শ্রমিক

তামিলনাড়ুর শিবকাশীর সুদর্শন ফায়ার ওয়ার্কস ইউনিটে গত ৯ই মে ২০২৪ দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। পুলিশের মতে রাসায়নিক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এই বিস্ফোরণ। কারখানায় শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। বিস্ফোরণে কারখানার ৭টি শেড ধ্বংস হয়, ৬টি ক্ষত্রিগস্ত হয়। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে জ্বলা এই আগুনে ৬ জন মহিলাসহ মোট ১০ জন শ্রমিক মারা যান। গুরুতর আহত হন ১৩ জন। সংস্থাটি সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, বারুদ নিয়ে কাজ হওয়া সত্ত্বেও কার্যতঃ কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। [সূত্র ঃ দ্য হিন্দু ১০/০৫/২০২৪]

রাজস্থানের হিন্দুস্থান কপার'এর খনিতে চাপা পড়ে ১ শ্রমিকের মৃত্যু, উদ্ধার ১৩ জন

গত ১৫ই মে রাজস্থানের কোলিহান অঞ্চলের ঝুনঝুনু খনিতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডের এই ভূগর্ভস্থ খনিতে হঠাৎ লিফটটি ভেঙ্গে পড়ে। ফলে ঐ লিফটে থাকা ১৪ জন শ্রমিক আটকা পড়েন। পরে উদ্ধার করা ১৪ জনের ১ জন মারা যান। [সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১৬/০৫/২০২৪]

হরিয়ানার সোনিপথের কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে মৃত ২ শ্রমিক

হরিয়ানার সোনিপথ শিল্প তালুকে শ্রী গণেশ ফ্যাক্টরিতে গভীর রাতে বয়লার ফেটে গিয়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হয়। প্রচন্ড বিস্ফোরণে মেসিনের টুকরোর আঘাতে এবং আগুনে পুড়ে কর্মরত ২ জন শ্রমিক ঘটনাস্থলে মারা যান, আহত হন ১৫ জন। ঘটনাটি ঘটে ১৬ই মে গভীর রাতে। আশপাশের বহু বাড়ি বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ছত্তিশগড়ে জমিতে কাজ করতে যাওয়া ১৯ জন কৃষি মজুর দুর্ঘটনায় মৃত

ছত্তিশগড়ের কওয়ার্ধা জেলায় কৃষিফার্মে কাজ করানোর জন্য আদিবাসী মহিলা ক্ষেতমজুরদের ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাক দ্রুত কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর জন্য তীব্রগতিতে চলছিল। ব্রেক ফেল করে ট্রাক রাস্তার পাশের ২০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে। দুর্ঘটনায় ১৫ জন নারী, ৩ জন কিশোরী ক্ষেতমজুর এবং ড্রাইভার মারা যায়। ঘটনাটি ঘটে গত ২০শে মে ভোরবেলায়।

মহারাষ্ট্রের থানেতে রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ১০ শ্রমিক

মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ডম্বিভিলিতে আমুদান কেমিক্যাল কোম্পানিতে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে বয়লার ফেটে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হয়। কারখানার আশপাশের সমগ্র অঞ্চল ধোঁয়াতে ঢেকে যায়। পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলির জানালার কাঁচ ফেটে যায় বিস্ফোরণের প্রাবল্যে। এই ঘটনায় ২ জন মহিলাসহ ১০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন ৬০ জন।

ছত্তিশগড়ে বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় মৃত ১ শ্রমিক, আহত ৬

ছত্তিশগড়ের বেমেতারা জেলার বারলা ব্লকের পিরদা গ্রামে একটি ডিটোনেটর (বিস্ফোরক) তৈরির কারখানায় গত ২৫শে মে ২০২৪ একটি প্রকান্ড বিস্ফোরণে ১ জন শ্রমিক নিহত হন এবং ৬ জন গুরুতর আহত হন। এই কারখানায় খনি ও অন্যান্য শিল্পের জন্য এই বিস্ফোরক তৈরি হত। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু ২৬/০৫/২০২৪)

দিল্লীর নারেলায় মুগডাল ভাজার কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৩ জন এবং আহত ৯ জন

দিল্লীর নারেলা শিল্পাঞ্চলে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় গত ৮ই জুন ২০২৪, এক বিস্ফোরণে ৩ জন শ্রমিক মারা যান, গুরুতর আহত হন ৯ জন। শ্যাম কৃপা ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে কাঁচা মুগডাল ভাজা হচ্ছিল গ্যাস বার্নারে। একটি পাইপ লাইনে লিক হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রচন্ড উত্তাপে কম্প্রেসার ফেটে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। [তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া ৯/৬/২০২৪]

ত্রিপুরায় অব্যবহৃত কুয়া পরিষ্কার করতে গিয়ে ৩ জন সাফাই কর্মী নিহত

ত্রিপুরার মেলাঘর থানা এলাকার দক্ষিণ তৈবান্দা এডিসি স্কুলে একটি অব্যবহৃত কুয়া পরিষ্কার করতে গিয়ে কুয়ায় জমে থাকা বিষাক্ত (সম্ভবত মিথেন) গ্যাসের প্রভাবে ৩ জন সাফাই কর্মী মারা যান গত ৮ই জুন ২০২৪, সকালে।

দক্ষিণ কুয়েতে শ্রমিক আবাসনে আগুন লেগে ৪৯ শ্রমিক হত, আহত অসংখ্য

কুয়েতের জনসংখ্যার ২১ শতাংশই ভারতীয় (প্রায় ১০ লক্ষ) এবং কুয়েতের মোট শ্রমিকদের ৩০ শতাংশ (প্রায় ৯ লক্ষ) ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই দেশে শ্রমিকরা কাজ করতে যান, এদের মধ্যে কেরালা রাজ্যের সর্বাধিক। বিভিন্ন কোম্পানির মালিকরা ঐ শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করে (ব্যারাকের মত) বহুতল আবাসনে। এমনই এক আবাসনে গত ১২ই জুন ২০২৪-এ দুর্ঘটনা ঘটে। এনবিটিসি নামের একটি নির্মাণ কোম্পানির ৬ তলা আবাসনে আগুন লাগে। নিচতলার রান্নাঘরে ভোরবেলা আগুন এবং তা সমগ্র আবাসনটিতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ৪৯ জন শ্রমিক নিহত হন। এর মধ্যে ৪৫ জনই ভারতীয়।

হরিয়ানার গুরগাঁও-অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র তৈরির কারখানা বিস্ফোরণে মৃত ৪, আহত ৬ শ্রমিক

হরিয়ানার গুরগাঁও এর দৌলতাবাদ শিল্পাঞ্চলে এক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র তৈরির কারখানায় গত ২২শে জুন রাত্রে (ইংরাজি তারিখ অনুসারে ২৩শে জুন রাত ৩টায়) প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে তৎক্ষণাৎ ৪ জন শ্রমিক মারা যান এবং ৬ জন গুরুতর অসুস্থ হন। প্রশাসনের অভিযোগ সংস্থার মালিক কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই উৎপাদন করাতো।

তামিলনাড়ুতে বাজি কারখানায় আগুন লেগে ৪ শ্রমিক নিহত, আহত ১

তামিলনাড়ুর সাত্তুর জেলার বানভাপট্টিতে গুরু স্টার ওয়ার্কস এর একটি বাজি তৈরির কারখানায় গত ২৯শে জুন ২০২৪, ৪ জন শ্রমিক নিহত এবং ১ জন আহত হন। জেলা রেভিন্যু অফিসারের বক্তব্য হল লাইসেন্সপ্রাপ্ত এই সংস্থায় কাজ চলার সময়ে রাসায়নিকের মিশ্রণ ঘটানোর সময় ঘর্ষণের ফলে বিস্ফোরণ ঘটে ও আগুন জ্বলে ওঠে। তৎক্ষণাৎ কারখানার ম্যানেজার সহ ৪ জন শ্রমিক নিহত হন। কারখানার ওয়াচম্যান বিস্ফোরণে ফলে ছুটে আসা কংক্রিটের টুকরোর আঘাতে আহত হন। বিস্ফোরণে কারখানার ৩টি শেড ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। [তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ৩০/০৬/২০২৪]

ওড়িশার রৌরকেল্লায় সেইল এর প্লান্টে গ্যাস লিকে ৮ জন শ্রমিক অসুস্থ

ওড়িশার রৌরকেল্লায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সেইল-এর ইস্পাত কারখানায় গত ১লা জুলাই ব্লাস্ট ফারনেস ৫ এ গ্যাস লিক করায় কর্মরত শ্রমিকরা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৮ জন গুরুতর অসুস্থ শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। [তথ্যসূত্র ঃ টাইম অফ ইন্ডিয়া, ২/৭/২০২৪]

গুজরাতের সুরেন্দ্রনগরে কয়লা খনিতে শ্বাসরোধের ফলে মৃত ৩ শ্রমিক

গুজরাতের সুরেন্দ্রনগরে রয়েছে অসংখ্য বেআইনি কয়লা খাদান। এই খাদানগুলিতে কোনরকম সুরক্ষা ছাড়াই অসংখ্য শ্রমিকরা কাজ করেন। গত ১৪ই জুলাই শ্বারোধের ফলে ৩ জন শ্রমিক মারা যান। এই নিয়ে এইবছরে এরকম ঘটনা ঘটল মোট ৪ বার, মারা গেলেন ১০ জন শ্রমিক। গত ফেব্রুয়ারি মাসে জিলেটিন স্টিক দিয়ে বিস্ফোরণের সময় বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ৩ জন শ্রমিক মারা যান। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ১৫/৭/২০২৪)

উত্তরপ্রদেশের ফরিদাবাদে বকেয়া বেতন চাওয়ায় মালিক পিটিয়ে মারল শ্রমিককে

উত্তরপ্রদেশের ফরিদাবাদে আরএমসিএ প্লান্টের মালিক ৩৫ বছর বয়সী শ্রমিক বেচন শাহকে পিটিয়ে হত্যা করে। কারণ শ্রমিকটি বার বার মালিকের কাছে তার বকেয়া মজুরি দাবি করে। এই কারখানাটি উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে অবস্থিত। (তথ্যসূত্র ঃ https://thepnnt.in)

অন্ধ্রপ্রদেশের রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে ১৭ শ্রমিক নিহত

অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপাল্লে জেলার অচ্যুতাপুরম স্পেশাল ইকোনমিক জোনে (SEZ) অবস্থিত ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক উৎপাদনকারী কারখানায় গত ২১শে অগাস্ট এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১৭ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়। এখানে দুটি শিফটে মোট ৩৮১ জন শ্রমিক কাজ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত দেড় বছরে এই কারখানায় মোট ৪ বার বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং প্রতি বিস্ফোরণেই শ্রমিকদের আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে। বর্তমান বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিটের রিঅ্যাক্টারে যান্ত্রিক গোলযোগকে দায়ী করা হয়েছে। কারখানার নিহত শ্রমিকদের অধিকাংশই চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করতেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প নিরাপত্তা বিষয়ক শ্রম আইন কার্যত কোথাও লাগু হয় না। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু – ২২/০৮/২০২৪)

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে নির্ণীয়মান রিসর্ট ভেঙে মৃত ৫ শ্রমিক

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার চোরাল গ্রামে একটি বিলাসবহুল রিসর্ট নির্মাণের কাজ চলছিল। গত ২৩শে অগাস্ট আচমকা ঐ নির্ণীয়মান রিসর্টের ছাদ ভেঙে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ ৫ জন নির্মাণ শ্রমিক ঘটনাস্থলে মারা যান। ঘটনাটি ঘটে মধ্যরাত্রে যখন শ্রমিকরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু ২৪/০৮/২০২৪)

ভারতে কৃষকদের আত্মহত্যা নিয়মে পরিণত

ন্যাশনাল ক্রামই রেকর্ড ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুসারে ভারতে

১৯৯৫-২০১৪ সময়কালে	২৯৬৪৩৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।
২০১৪-২০২২ সময়কালে	১০০৪৭৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।
২০২২ খ্রিস্টাব্দে	১১,২৯০ জন কৃষক (৫২০৭ জন ফার্মার এবং ৬০৮৩ জন ক্ষেত মজুর) আত্মহত্যা করেছেন।

১৯৭০ এর পর থেকে এই আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। চাষের জন্য ভূস্বামী, মহাজন এবং সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে চাষে লোকসান হওয়ায় ঋণ শোধ করতে না পারাটাই এই আত্মহত্যার কারণ বলে মনে করা হয়।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন (NSSO)র তথ্য অনুসারে দেশে কৃষিকাজে যুক্ত মানুষ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫.৫ শতাংশ। এই হার ক্রমশ কমছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (NCRB)র দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রতিবছর গড়ে দেশে ৫৭৬০ জন কৃষিকাজে যুক্ত মানুষ আত্মহত্যা করছেন। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে আত্মহত্যার সংখ্যা প্রায় ১৬ জন।

গত ১০ই জুলাই মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর ডিভিশনাল কমিশনারেট বলেন যে জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৪-এ মহারাষ্ট্রে ৫৫৭ জন ফার্মার ও ক্ষেতমজুর আত্মহত্যা করেছেন। এদের মধ্যে ১৭০ জন অমরাবতী, ১৫০ জন যাবাৎমাল, ১১১ জন বুলধানা, ৯২ জন আকোলা এবং ৩৪ জন ওয়াসিম জেলায়। ■

●২৩ *পৃষ্ঠার শেষাংশ .... বিজ্ঞানের খবর*

১৫. ●নাসা-র বিজ্ঞানীরা চাঁদের বুকে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট টানেল বা লাভা টিউব আবিষ্কার করেছেন। আনুমানিক ২০০টি লাভা টিউবের অস্তিত্বপ্রাথমিকভাবে জানা গেছে। আগামীদিনে এগুলি মহাকাশচারীদের আবাসস্থল হতে পারে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। (নাসা)

●চীনের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ২০২৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁরা 2015 XF261 গ্রহাণুতে একটি ইম্প্যাক্টর প্রোব প্রেরণ করতে চলেছেন। গ্রহাণুটি পৃথিবীর ৭০ হাজার কিমি দূরত্বের মধ্যে এলে প্রোবটি প্রতি সেকেন্ডে ১০ কিমি বেগে গ্রহাণুটির উপর আছড়ে পড়বে। সংঘর্ষের পর গ্রহাণুটির কক্ষপথের পরিবর্তন সহ অন্যান্য পরীক্ষা করা হবে। (স্পেস নিউজ)

৩০. ●উত্তর মহাসাগরে উপকূল-দূরবর্তী তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিষ্কাশন ক্ষেত্রগুলি থেকে দূষণের মাত্রা চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, জানাচ্ছেন গবেষকরা। নিষ্কাশক স্থলের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে দূষণের মাত্রা ১০০০০% অতিক্রম করেছে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ঐ অঞ্চলে মূলতঃ হাইড্রোকার্বন ও ভারী ধাতুর পরিমাণ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে এর ফলে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। (ইউরেক অ্যালার্ট)

●বোস্টনের একটি কোম্পানী 'পারসেপশন'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে তারা একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। যার দ্বারা দাঁতের একটি সম্পূর্ণ অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে দাঁতের ত্রিমাত্রিক গঠন জানা সম্ভব। প্রস্তুতকারক কোম্পানীর তরফে জানানো হয়েছে যে একজন দন্ত-চিকিৎসক একটি অপারেশনের জন্য যে সময় নেন, যন্ত্রটি তার এক-চতুর্থাংশ সময়ে তা সম্পন্ন করতে সক্ষম। (নিউজ অ্যাটলাস)

গল্পচ্ছলে বিজ্ঞান চর্চা ঃ

আলাপচারিতায় আইনস্টাইন ও তাঁর আবিষ্কার

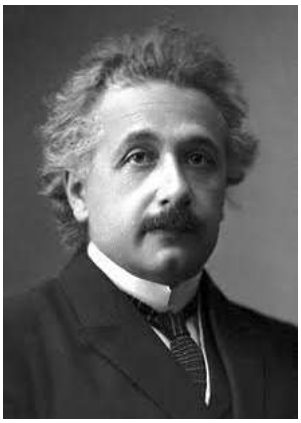

ভূমিকা ঃ বিগত ৪ঠা মে ২০২৪ ছাত্র-ছাত্রীদের ও উৎসাহীদের নিয়ে যে সেমিনার হয়েছিল সংগঠনের বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিটের উদ্যোগে তার প্রথম অংশ বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আইনস্টাইনের বিখ্যাত আবিষ্কার ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বিষয়ে আলোচনার পর একটা প্রশ্ন উঠে আসে।

প্রশ্ন ঃ যেকোনো ধাতু ব্যবহার চলবে আইনস্টানের আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার পরীক্ষার জন্য?

উত্তর ঃ না যেকোনো ধাতু চলবে না। সেটা নির্ভর করে আপতিত আলোক রশ্মির কম্পাঙ্কের উপর। সব ধাতুর পরমাণুগুলো তার বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলিকে একই শক্তি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে না। তাই যার ক্ষেত্রে এই আকর্ষণ কম সেই ধাতুগুলিকে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে কম কম্পাঙ্কের আপতিত আরোক রশ্মি কাজ করবে। সাধারণত সিজিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, লিথিয়াম-এর মত ক্ষারীয় ধাতুগুলি খুবই সংবেদনশীল।

সঞ্চালক ঃ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন আরেকটা কাজ করলেন, যে কাজটা খুবই বিখ্যাত। সেই কাজটা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার ফোকাস। সেটা কী?

উত্তরের অপেক্ষায় অনেকটা সময় পর উত্তর আসে,

উত্তর ঃ স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি।

সঞ্চালক ঃ অর্থাৎ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। এই আপেক্ষিকতা সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা আছে বল?

উত্তর ঃ ধরুন আমি দেখছি আপনি বসে আছেন, মানে স্থির। কিন্তু আপনি ঘুরছেন, কারণ পৃথিবী ঘুরছে। আমার দৃষ্টি আপনি স্থির। কিন্তু ...

সঞ্চালক ঃ অন্য কেউ কিছু বলবে?

ও বলেছে আমরা যেখানে বসে আছি, পৃথিবী কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? পৃথিবী তার নিজের অক্ষে ঘুরছে। তাহলে পৃথিবীর সাথে আমরাও ঘুরছি। আবার পৃথিবী কী করছে, সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। তাহলে সেভাবেও আমরা ঘুরছি। বল দেখি সূর্যের চারদিকে পৃথিবী কী রকম বেগ নিয়ে ঘোরে?

একটা ট্রেন যেরকম বেগে ছোটে, তার থেকে একটু কম, তাই না? তুমি কিন্তু ছিটকে পড়ছো না বাইরে। তাহলে ট্রেনের থেকে একটু কম বেগে ঘুরছে? প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছো?

পৃথিবী তার অরবিটে (কক্ষপথে) ঘোরার স্পিড বা দ্রুতি কত?

উত্তর ঃ ৩০ কিমিঃ প্রতি সেকেন্ড।

সঞ্চালক ঃ ধর্মতলা এখান থেকে ১২ কিমিঃ। তাহলে ৩০ কিমিঃ কতটা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছো। ততদূরে এক সেকেন্ডে যাওয়ার মতো চলেছে সে। ব্ল্যাকহোল নিয়ে আলোচনা করার সময় (এই আলোচনার পূর্বে ব্ল্যাকহোল নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়েছিল।) বলেছিলাম যে, এমন একটা বেগে কোনো বস্তুকে যদি আমরা ছুঁড়ে দিই, সে আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। সে মহাকাশে মহাকাশে বিলীন হয়ে যাবে। কত বেগে ছুঁড়লে তা হবে?

উত্তর ঃ ১১.২ কিমি প্রতি সেকেন্ড। এটাকে বলে এসকেপ ভেলোসিটি।

সঞ্চালক ঃ এটার সঙ্গে তুলনা করো। এটার থেকে কত? প্রায় তিন গুণ। এমন বেগে ছুঁড়ছো যে সেটা পৃথিবীতেই ফিরে আসবে না, অথচ তোমার পৃথিবী তার তিনগুণ বেগে নিজ অরবিটে (কক্ষপথে) ঘুরছে।

এরকম ভাবনা কত অদ্ভুত লাগে! ঐ যে কম্পাসটাকে অদ্ভুত লেড়েছিল আইনস্টাইনের, তেমন। তোমাদের কাছে অদ্ভুত লাগছে না? এক সেকেন্ডে সে এত দূরে চলে যাচ্ছে, তার উপর আবার নিজের অক্ষ বরাবরও ঘুরছে। অথচ কিছুই বুঝতে পারছি না। অদ্ভুত লাগে না!

অদ্ভুত লাগার কারণ আইনস্টাইন কী বলেছিলেন? আমাদের মনে যে ধারণাটা রয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তব যখন ম্যাচ না করে তখন অদ্ভুত মনে হয়। যাই হোক আমরা আপেক্ষিকতা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই আপেক্ষিকতা অনুসারে সব কিছু সাপেক্ষিক। এটাকেই বলি আপেক্ষিকতা। এবার এরকম যদি হয়, যে একটা স্টেশনে দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে দুই দিকে। ট্রেন দুটো চলার সময় কোনো জার্কিং হয় না ধরে নাও। এক সময় এদের মধ্যকার

একটা ট্রেন চলা শুরু করলো। এক ট্রেনের যাত্রী মনে করবে অপর ট্রেনটি গতিশীল। নিজে স্থির। অপর ট্রেনের যাত্রীও একই রকম মনে করবে। তাহলে কোন্‌টা সত্যি?

উত্তর ঃ কোনোটাই না।

সঞ্চালক ঃ প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রী মনে করবে সে স্থির, অপর ট্রেনটি গতিশীল। একই রকমভাবে বিষয়টিকে স্পেসে ভাবো। সেখানেও একই রকম অনুভব হবে। দার্শনিক জায়গা থেকে কোনটাকে ঠিক বলবে?

উত্তর ঃ কে দেখছে, তার উপর নির্ভর করছে।

সঞ্চালক ঃ কিন্তু এই উভয় পর্যবেক্ষণের কোন্‌টা সত্য?

আইনস্টাইন বললেন দুটোই সত্য, দুটো ঘটনাই। তিনি বললেন পদার্থ বিদ্যায় যে নিয়মগুলো সেগুলো সমস্ত জড় নির্দেশতন্ত্রে (inertial reference frame)-এ প্রযোজ্য। অর্থাৎ নির্দেশতন্ত্র বা যেখান থেকে বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে (যেমন যে কোনো ট্রেন বা স্পেসে থাকা কোনো বস্তু) সেখানটা যদি স্থির থাকে বা সমবেগে চলে। তার আগে এরকম একটা কথা কিন্তু নিউটন বলেছিলেন। তিনি বস্তুর গতির সূত্রগুলি বলেছিলেন, বা বল সম্পর্কে যে সূত্রগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো কার্যকর হবে যখন গতিশীল বস্তুকে যে অবসার্ভ (পর্যবেক্ষণ) করছেন, সে নিজে যদি ত্বরণে না থাকে।

এরপর কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার আলোচনা সভা শুরু হয়।

সঞ্চালক ঃ আমরা অতি সরলীকরণ করে বিষয়গুলো হাজির করছি। এতে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। বিজ্ঞানীরা এটা পছন্দ করেন না। অতিসরলীকরণ করতে গিয়ে অনেক ভুল তথ্য চলে যায়। কিন্তু এখানে সরলীকরণ না করলে এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করতেই পারবো না। কারণ এর যে ইকুয়েশনগুলো, যে ডেরিভেশনগুলো ম্যাথামেটিক্স বেস, সেই ম্যাথামেটিক্সটাকে যদি এনে বলতে হয়, তবে কিন্তু এইভাবে আজকে তোমাদের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভবই নয়। ফলে এই ত্রুটি নিয়েই আমাদের কিন্তু এগোতে হবে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তোমাদের মনে যদি কিছু প্রশ্ন ওঠে, একটা সাধারণ আইডিয়া তৈরি হয়, তবে এটাই হবে আজকের আলোচনার সাফল্য। সেটা শুধু আমার কথা দিয়ে নয়, তোমাদের অংশগ্রহণ চাই।

আমি সবার প্রথমে কতগুলি প্রশ্ন নিচ্ছি। বল কার কী প্রশ্ন আছে এ ব্যাপারে।

প্রশ্ন ঃ যদি পৃথিবীর গতিবেগ বাড়ানো হয়, সে কি নিজের অক্ষের বাইরে বেরিয়ে যাবে?

আর যদি কমানো হয়, তখন কী হবে?

সঞ্চালক ঃ আর অন্য প্রশ্ন?

প্রশ্ন ঃ স্পেস (টাইম) কার্ভেচার কী?

সঞ্চালক ঃ ঠিক আছে আমরা আবার শুরু করছি। ধরি একটা ট্রেন নির্দিষ্ট একটা দিকে v_1 গতিবেগে যাচ্ছে। একই বেগে আরেকটা ট্রেন একই দিকে ধাবমান হলে এক ট্রেনের যাত্রি অপর ট্রেনকে দেখবে স্থির। যদি দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগ v_2 হয় যেখানে $v_1 \rangle v_2$ তখন দ্বিতীয় ট্রেন থেকে প্রথম ট্রেনটিকে $(v_1 - v_2)$ বেগে সামনের দিকে গতিশীল মনে হবে।

যদি এই দুটি ট্রেন পরস্পর উল্টোদিকে যাত্রা করতো তখন একের সাপেক্ষে অন্যটির বেগ $(v_1 + v_2)$ মনে হোত। কিন্তু তোমরা চিন্তা কর প্রথম ট্রেনটির স্থলে আছে আলোক রশ্মি (c গতিবেগে)। দ্বিতীয় ট্রেনটি যেমন আগে গতিশীল ছিল (v_2) তেমনি আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে $v_1 = c$ ধরা যাক। তবে কি দ্বিতীয় ট্রেনটি আলো $v_1 - v_2 = (c - v_2)$ বেগে গতিশীল দেখবে? যদি ট্রেনটি আলোর বিপরীত দিকে যাত্রা করতো তবে সে আলোর গতিবেগ $v_1 + v_2 = (c + v_2)$ দেখতো?

দেখো আলোর গতিবেগ পাল্টে গেছে। আইনস্টাইন এখানে একটা কথা বললেন। কী বললেন? তিনি বললেন আলোর গতিবেগ সব সময় স্থির। এবং আলোর গতিবেগ হল এই মহাবিশ্বের সর্বাধিক গতিবেগ। তাহলে আলোর গতিবেগ স্থির থাকলে আমাদের ধারণা তো মিলছে না। উভয় ক্ষেত্রে আপেক্ষিক গতিবেগ c রাখলে কী করতে হবে? সেই কথাগুলো তিনি স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে বললেন। উনি বলেছেন আলোর গতিবেগ $(c_1 + v_2)$ বা $(c - v_2)$, এর কোনোটাই হতে পারে না। আইনস্টাইন এও ভাবলেন পর্যবেক্ষক যদি আলোর বেগে চলতে পারতো তার সাপেক্ষে আলোর বেগ ($c - c$ অর্থাৎ শূন্য) হতে হয়।

আলোর গতিবেগ শূন্য অর্থাৎ আলো স্থির। অথচ আলোকে একটু আগে কী বলেছি, বলেছি এটা একটা তরঙ্গ চল তরঙ্গ। একটা তরঙ্গ কীভাবে স্থির থাকে? আইনস্টাইনের মনে এই প্রশ্নটা বড় করে এলো। এবং প্রশ্নটা শুধু এই সময় অর্থাৎ ১৯০৫ সনেই আসে নি, এই প্রশ্নটা তাঁকে ছাত্রজীবনেই ভাবিয়ে তুলেছিল। কেন না এই সময়ের পূর্বেই আবিষ্কার হয়ে গেছে

আলো একটা তরঙ্গ। বিজ্ঞানীরা সবাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে ম্যাক্সওয়েল বলে একজন বিজ্ঞানী দেখালেন আলো একপ্রকার চলতরঙ্গ (প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ)। তোমাদের বলে রাখি চলতরঙ্গ হল সেই তরঙ্গ যা চলতে থাকবে। কিন্তু আলো যদি থেমে যায়, তবে তা চলতরঙ্গ কীভাবে থাকে? এই সমস্যাটার মুখোমুখি হল।

কোনো আলো যখন কোনো তারা থেকে আসে, তখন মহাশূন্য হয়ে তা আসে। অর্থাৎ আসার সময় কোনো মাধ্যম দরকার হয় না। আমরা এখন এটা জানি। কিন্তু সে সময় বিজ্ঞানীদের মনে কিন্তু এটা কখনোই আসে নি। তারা কী জানতো? তারা জানতো, কোনো তরঙ্গ চলার জন্য বাতাস প্রয়োজন। স্বাভাবিক বোধ বুদ্ধি অনুযায়ী তখন তাঁদের মনে হোত আলো চলাচলের জন্যও একটা মাধ্যমের প্রয়োজন। ম্যাক্সওয়েল ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে যখন আবিষ্কার করলেন এরকম একটা প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ (চলতরঙ্গ), তারপরেও একটা আইডিয়া ছিল যে এর একটা মাধ্যম দরকার। সেই মাধ্যমটা কী হবে? বিজ্ঞানীরা মোটামুটি সবাই মেনে নিল সেই মাধ্যমটা হচ্ছে ইথার। ইথারের মধ্য দিয়ে আলো যায়। কিন্তু এর মধ্যে মাইকেলসন এবং মোরলে নামক দু'জন বিজ্ঞানী ১৮৮১ এবং ১৮৮৮ এই দুটো সময় একটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন এবং সেই এক্সপেরিমেন্ট থেকে ইথারের এক্সিজসটেন্সকে (উপস্থিতিকে) নাকচ করে দিলেন। কেন না তাঁরা যে এক্সপেরিমেন্টটা করলেন, সেখানে দেখালেন ইথারকে নিয়ে পৃথবী যে ঘুরছে সে দিকে বা তার বিপরীতে আরোর গতিবেগ পাল্টাচ্ছে না। তারমানে ইথার থাকা বা না থাকার জন্য আলোর গতিবেগে কোনো প্রভাব পড়ছে না। ইথার না হলেও চলে এমন প্রমাণিত হলেও মাধ্যমের ভূতটা তখনো বিজ্ঞানীদের মন থেকে দূর হয় নি। এর পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী হার্টর্জ ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ-ই আবিষ্কার করে ফেললেন। তার আগে ম্যাক্সওয়েল আলোর গতিবেগ 3×10^8 মিঃ/সেকেন্ড আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এর মধ্যে লরেনস্ বলে একজন বিজ্ঞানী দারুন এক কাজ করেছেন। তিনি দেখান যে কোনো একটা বস্তু যখন গতি নিয়ে চলবে, তখন সেই বস্তুটা কিছুটা সংকুচিত হয়ে যাবে গতির জন্য। গতির অভিমুখে দৈর্ঘ্য কমে যাবে। লরেনস্-এর আগে আরো অন্য বিজ্ঞানীরা এরকম কথা বললেও তিনি আরো প্রণালীবদ্ধভাবে গণিত দিয়ে একথা প্রকাশ করেছিলেন। এরজন্য লরেনস্ ট্রান্সফরমেশনের কথা তোমরা শুনে থাকবে। আমরা সহজ করে বোঝার জন্য শুধু এটুকুই বলবো যে কোনো বস্তু যখন চলছে, তখন সে গতির দিকে সংকুচিত হয়ে যায়। তুমি যদি দৌড়ে যাও, তাহলে তুমি কিন্তু একটু পাতলা হয়ে যাবে। বুঝতে পারলে? একদিন দৌড়ে দেখবে জোড়ে, দেখতে পারবে তো?

একথা শুনে সবাই একটু হতবাক হয়ে পড়ে। তখন সঞ্চালক হেসে জবাব দেন,

সঞ্চালক ঃ হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পারবো না। অপেক্ষাকৃত কম দ্রুতিতে গেলে এই সংকোচনটা এত নগণ্য হবে যে তা ধরা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ এটা কেন হয়?

সঞ্চালক ঃ এটা একটা ভালো প্রশ্ন। এর উত্তরে যাওয়ার আগে বলি লরেনস্ বললেন সময়টাও বড় হয়ে যায়। অর্থাৎ এখন যেটা এক মিনিট, গতিশীল অবস্থায় তখন সে দু'মিনিট অর্থাৎ সময়ের প্রসারণ ঘটে। একে টাইম ডায়লেশন বলে। এক সেকেন্ড সময়ের দৈর্ঘ্য যতটা, সেই সময়ের দৈর্ঘ্যটা আরো বেড়ে যাবে, যখন কোনো বস্তু গতিশীল অর্থাৎ দুটো জিনিস হলো। সময়ের প্রসারণ এবং দৈর্ঘ্যের সংকোচন।

এটা কেন বলেছেন? আইনস্টাইন একটা কথা বললেন, এটা হওয়অর কারণ প্রত্যেকটা বস্তু কতগুলি ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে তৈরি। এই বস্তুটা যখন গতিশীল হয় তখন ইলেক্ট্রোডিনামিক্সের নিয়ম অনুসারে একটা ফোর্স বা বল তৈরি হয়, এবং সেই বল বস্তুটাকে উল্টোদিকে চাপ দেবে। তার ফলে ঐ বস্তুটার সংকোচন হবে। উনি এই ব্যাখ্যা দিলেন।

প্রশ্ন ঃ কতটা কমবে, সেটা বলা যাবে?

সঞ্চালক ঃ হ্যাঁ, তিনি বললেন যে ফ্যাক্টরে কমবে সেটা হল

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}},$$

দৈর্ঘ্য এই ফ্যাক্টরে (ভগ্নাংশে) কমবে, সময় এই ফ্যাক্টরে বাড়বে। এবার তুমি মনে করো এই যে বস্তুটা আছে v তার গতিবেগ আলোর গতিবেগের $\frac{1}{7}$ অংশ $\therefore v=\frac{c}{7}$ ফলে এই ফ্যাক্টরটা হবে

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{c^2}{49c^2}}}\left[\because c\neq o\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{49}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{48}{49}}} = \sqrt{\frac{49}{48}}$$

$$\approx 1.01$$

সঞ্চালক ঃ কত শতাংশ বাড়লো?

উত্তর ঃ এক শতাংশ।

সঞ্চালক ঃ সুতরাং আলোর গতিবেগের সাতভাগের একভাগ গতিবেগে কোনো বস্তু গতিশীল হলে গতির অভিমুখে দৈর্ঘ্য কমবে মোটামুটি এক শতাংশ। সময়টার কী হবে?

উত্তর ঃ বেড়ে যাবে।

সঞ্চালক ঃ এক শতাংশ বেড়ে যাবে।

এই পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের আইডিয়া ছিল এই মহাবিশ্ব একটা রিজিড ম্যাটার, মানে মহাবিশ্বের গঠন। অর্থাৎ তার স্পেসটা স্থির, রিজিড। এটা মেনে নিয়েই পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্ত কিছু চলতো। আইনস্টান এখানে এসে একটা বড় কথা বললেন। তিনি বললেন – **"না এই ইউনিভার্সটা রিজিড নয়, মানে অনমনীয় নয়।"** এই মহাবিশ্বটা তাহলে কী?

উনি বললেন – "নমনীয়।"

তোমাদের মধ্যে একজন 'স্পেস-টাইম কন্টিনামের' কথা জিজ্ঞেস করছিল। তার সাথে এই প্রশ্নটা রিলেটেড। এ প্রসঙ্গে বোঝার আগে তোমাদের জিজ্ঞেস করি স্পেস বলতে আমরা কী বুঝি?

মহাবিশ্বের একটা জ্যামিতিক গঠন আছে। কীরকম জ্যামিতিক গঠন? আমরা যেমন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং উচ্চতা নিয়ে একটা বস্তু দেখি, ত্রিমাত্রিক বস্তু। এই বস্তুগুলি নিয়েই তো এই মহাবিশ্ব। কিন্তু এই বস্তুগুলো যে স্পেসে বা ফাকা জায়গায় রয়েছে, তার নিজস্বও একটা গঠন আছে। এই গঠন বা স্ট্রাকচারে এরা সেট। যে স্ট্রাকচারটা আমরা চোখে দেখতে পারি না, স্পর্শ করতে পারি না, তার কোনো প্রভাব বুঝতে পারি না। এর জন্য সেটাকে আমরা ধারণা করতে পারি না। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, তারও একটা জ্যামিতিক গঠন রয়েছে।

সাধারণ মহাবিশ্বের এই স্ট্রাকচার সম্পর্কে মানুষ মনে করতো এটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং উচ্চতা নিয়ে এবং সময় এই স্পেসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তার আগে জিজ্ঞেস করি সময় কী?

সময় কখন শুরু হয়েছিল? না কি অনন্তকাল ধরে সময় চলছে?

কিছুটা সোরগোলের পর একজন উত্তর দিল –

উত্তর ঃ বিগ ব্যাং থেকে সময় শুরু হয়েছে।

সঞ্চালক ঃ আমাদের জানা মতে তাই। কেন? আমরা বিগ ব্যাং-এর আগে (এখানে বলার, বিগ ব্যাং এমন একটা তত্ত্ব, যে তত্ত্ব আমাদের ব্যাখ্যা দেয় এই মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হল। কিন্তু এটা যে এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা কখনো একথা বলেন না। তবে যে সমস্ত কারণগুলো দেখান, তাতে অধিকাংশ বিজ্ঞানী সহমত পোষণ করেন যে এরকম একটা ব্যাপার হতে পারে। তবে তার একদম অকাট্য প্রমাণ মানুষের কাছে নেই। তবে অনেক প্রমাণ আছে। এইজন্য অধিকাংশ বিজ্ঞানী মোটামুটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে সব থেকে গ্রহণযোগ্য থিয়োরি হিসেবে বিগ ব্যাং'কে মেনে নেয়) সময়কে পাই না কেন?

আইনস্টাইন বললেন সময় ওরকম ব্যাপার নয়। সময় কোনো একটা ঘটনা (ইভেন্ট) ঘটার সাথে যুক্ত। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা এবং সময় – এই চারটে জিনিস নিয়ে বিজ্ঞান ইভেন্ট বা ঘটনা বোঝে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের এই চারটি ডায়মেনশন বা মাত্রা আছে এবং একই সাথে আছে। তার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বলতেন টাইমটা আলাদা জিনিস। টাইম বা সময়ের সাথে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতাকে কীভাবে মেলাবে? কিন্তু আইনস্টাইন বললেন – 'না, সময়কে মিলিয়েই এগুলো রয়েছে।' তাহলে সময় বা টাইমকে নিয়ে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা যদি মাপি, তাহলে এরকম তিনটে অক্ষ বা অ্যাক্সিস আমরা বলতে পারি, এর সাথেই আরেকটি মাত্রা টাইম তিনি বললেন। একে সাধারণভাবে ছবি এঁকে বোঝানো সম্ভব নয়। খুব সহজ করে বললে দাঁড়ায় টাইম আর স্পেস একই অবস্থায় রয়েছে এবং তাই নিয়েই মহাবিশ্বের স্ট্রাকচারটা। তুমি যদি এটাকে ফিজিকালি বুঝতে চাও, তবে বলতে পারি স্পেস টাইম কার্ভেচার হল চারটি মাত্রা একে অপরের সাপেক্ষে দুমরে মুচরে গেছে। এটাই স্পেসের জ্যামিতিক গঠন যা সতত বেঁকে গিয়ে কখনো স্থির নয়। কে এই গঠনটাকে পাল্টে দিতে পারে? যে কোনো বস্তু তার সাথে যদি সম্পর্কিত হয়, তাহলেই এই জ্যামিতিক গঠনটা পাল্টে যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রভাব রয়েছে। এটা প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে।

উত্তর ঃ একজনের অবস্থান পাল্টে যাও বাকি জ্যামিতিক গঠনকে পাল্টে দিচ্ছে?

সঞ্চালক ঃ হ্যাঁ, এইজন্যই একে বলা হচ্ছে নমনীয়। এটা কিন্তু মানুষের চিন্তা জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটালো। (ক্রমশ)

সংগঠন সংবাদ

উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠান ঃ গত ৭ই জুলাই উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে রামকিঙ্কর (তথ্যকেন্দ্রে) হলে "মহাবিশ্বের সৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি' শীর্ষক এক সেমিনার হয়। ঐ সময়ে উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচুর মানুষ এসেছিল অনুষ্ঠানটিতে। অনুষ্ঠানে তিনজন বক্তব্য রাখেন সংগঠন থেকে। স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গীত পরিবেশন যথেষ্ট শ্রুতিমধুর ছিলো।

হিরোসিমা নাগাসাকি দিবস

গত ৯ই অগাস্ট হিরোসিমা নাগাসাকি দিবসে বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিটে বেহালা সখের বাজারে একটি পথসভা হয়।

ঐ একই দিনে পাথর প্রতিমায় একটি পথসভা হয়। বিষয় ছিল – পরমাণু বোমা ফেলার পরের যে ভয়াবহতা এবং যুদ্ধের কারণ ও তার সমাধানের উপায় কি?

গত ১৮ই অগাস্ট বেহালা ঠাকুরপুকুর শাখার উদ্যোগে "আগামী পৃথিবী কি শিশুর বাসযোগ্য হবে না?" এই শীর্ষকে একটি আলোচনা সভা রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এখানে বক্তারা সকলেই স্কুল-কলেজের পড়ুয়া। হিরোসিমা-নাগাসাকি থেকে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত কি, সেটা খুবই সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। এবং একই সাথে আর জি করের ডাক্তার খুন ও ধর্ষণের কথাও উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। আলোচনার মান যথেষ্ট উন্নত ছিলো। অনুষ্ঠানে একটি শ্রুতিনাটক অনুষ্ঠিত হয়।

২০শে অগাস্ট জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবস

এই বছর জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবসে সোনারপুরে একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয়। এবং একটি মিছিল ও তিনটি পথসভা হয়। এছাড়া পুরুলিয়া সদরে ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুরে মিছিল ও পথসভা হয়। এই মিছিল ও পথসভাগুলিতে কুসংস্কার দুরীকরণের উপায়ের সাথে সাথে পিতৃতন্ত্র অবসানের কথাও বলা হয়। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রাস্তাগুলি।

জাস্টিস ফর আর জি কর

গত ৯ই অগাস্ট আর জি করে জুনিয়র ডাক্তার তিলোত্তমার মৃত্যুর প্রতিবাদে সারা বাংলা তথা সারা বিশ্বে যে ঝড় ওঠে বিজ্ঞান মনস্ক তাতে সাধ্যতিত অংশগ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে সমগ্র বিজ্ঞান মনস্ক কর্মীদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। এই আন্দোলন এখনো চলছে, কর্মরত অবস্থায় ঐ ডাক্তারকে যে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছে তাতে সারা বিশ্ব কেঁপে উঠেছে। শ্রমজীবী মানুষ সহ সমস্ত সাধারণ মানুষ ফুঁসে উঠেছে। কোন রাজনৈতিক দল এখনো অবধি সুবিধা করতে পারে নি। এই গণআন্দোলন শুধু মাত্র এই একটি ঘটনার কারণে নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলা দুর্নীতি, খুন, জখম, ধর্ষণ যে হারে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে মানুষের এই প্রতিবাদ। তাই তো আওয়াজ উঠেছে "পিতৃতন্ত্র নিপাত যাক" ... "যে রাষ্ট্র ধর্ষককে মদত করে, আসলে রাষ্ট্রই ধর্ষক'। "দুর্নীতি বাজদের মাথা ধর" ... ইত্যাদি ইতাদি। এখন মিছিল মানুষকে খুঁজছে না, মানুষ মিছিল খুঁজছে।

বিজ্ঞান মনস্ক পশ্চিমবঙ্গ কখনো সকলের সাথে, কখনো এককভাবে, আবার কখনো ব্যানার সহ অনুষ্ঠান করেছে।

গত ১৪ই অগাস্ট রাতে 'রাত দখলের' আওয়াজে বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীরা তাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পরে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি প্রভৃতি জেলাগুলোতে। স্লোগানে স্লোগানে কাঁপিয়ে দেয় রাত। সেই থেকে শুরু করে এখনো অবধি চলছে। "তিলোত্তমা ভয় নাই, রাজ পথ ছাড়ি নাই।"

এই আন্দোলন মূলতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণী শুরু করলেও ক্রমশ শ্রমজীবী মানুষ যুক্ত হচ্ছেন এর সাথে। বিজ্ঞান মনস্ক শ্রমজীবী মানুষের সাথে এই আন্দোলনের মেলবন্ধন ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বেহালা-ঠাকুরপুকুর ইউনিট তিনটি জায়গায় ব্যানার সহ পথসভা করেছে ও আগামীতে আরও করবে। মানুষের উৎসাহ, জিজ্ঞাসা চোখে পড়ার মত। বনগাঁতে সংগঠনের উদ্যোগে তিনটি পথসভা ও মিছিল সংঘটিত করা হয়। হাজার হাজার মানুষ তাতে জড়ো হয়। সহযোগী সংগঠনের সাথে পাথরপ্রতিমা অঞ্চলে মিছিল করা হয়। শ্রমজীবী মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন এই মিছিলগুলিতে। সোনারপুরে পথসভা হয় কোন সংগঠনের নাম না নিয়ে শিলিগুড়ি, বেহালা-ঠাকুরপুকুর, বনগাঁ, গোচরণ,

হাওড়া আমতা, সোনারপুর, পুরুলিয়া, আসানসোল ইত্যাদি জায়গায় মিছিল, পথসভা হয়।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর জুনিয়র ডাক্তাররা ডাক দেয় রাত ৯টা থেকে ১০টা আলো নিভিয়ে মানব বন্ধন গড়ে তোলে। সেই মত বেহালা-ঠাকুরপুকুর, সোনারপুর, বনগাঁ, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি, আসানসোল অঞ্চলে সংগঠনের উদ্যোগে হাজার হাজার মানুষ মানব বন্ধনে সামিল হয় এবং গর্জে ওঠে "উই ডিমান্ড জাস্টিস।"

এছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রতিদিনই কোন না কোন মিছিলে বিজ্ঞান মনস্কর কর্মীরা পা মিলিয়েছেন। জুনিয়র ডাক্তাররা স্বাস্থ্যভবন অভিযান করে ৫ দফা দাবি নিয়ে স্বাস্থ্যভবনের সামনে অবস্থান করে। বিজ্ঞান মনস্কর কর্মীরা নিয়ম করে প্রায় প্রতিদিনই সামিল হয়েছিল কলকাতা ও দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণা থেকে তাদের পাশে থেকে তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে।

গত ২৬শে অগাস্ট ডাক্তাররা গণকনভেনশন করে। উপস্থিত ছিল সিনিয়র চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন। এছাড়া বিভিন্ন সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, বিনোদন জগতের লোকজন। এইখানে বলা হয় কি ভাবে এই আন্দোলন শুরু করে ডাক্তাররা এবং আগামী দিনে যদি বিচার সঠিক পথে না এগোয় তাহলে আরো বড় কর্মসূচীতে এগোবে ডাক্তাররা।

আন্দোলন এখনো চলছে বিজ্ঞান মনস্ক এখনো পথেই আছে। দাবি না মেটা অবধি আন্দোলন চলবে।

ক্ষুদিরামের শহীদ দিবস

গত ১১ই অগাস্ট ক্ষুদিরামের শহীদ দিবস পালন হয় বিভিন্ন জায়গায়। বনগাঁয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ক্ষুদিরামের সম্পর্কে বলা হয় এবং বর্তমান যুগে ক্ষুদিরামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিট স্থানীয় সংগঠন জাগরণের সাথে গান, কবিতা, অঙ্কন ও বক্তৃতার মাধ্যমে ক্ষুদিরামকে স্মরণ করা হয়।

"বিশ্ব উষ্ণায়নের স্বরূপ" বিষয়ক সেমিনার

বিগত ১৫ই অগাস্ট ২০২৪, পুরুলিয়াতে "বিশ্ব উষ্ণায়নের স্বরূপ" শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মোট ১৫ জনকে নিয়ে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনা করা হয়। এঁরা সকলেই সমীক্ষণের পাঠক।

আলোচনা হয় চারটে স্তরে। প্রথমে আলোচনার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা হয় এবং উপস্থিত সকলকে আবেদন করা হয় যেন তারা এবিষয়ে নিজস্ব ধারণা, মতামত, প্রশ্ন একে একে তুলে ধরেন। দ্বিতীয় স্তরে প্রত্যেকে নিজেদের প্রশ্ন এবং মতামত ব্যক্ত করেন। তৃতীয় স্তরে আগত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়। এ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সবার সামনে রাখা হয়।

একদম শেষে উপস্থিত দর্শকরা কিছু প্রশ্ন হাজির করেন। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কি? কিভাবে তা হিসাব করা হয়?

২) বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দেশগুলো যে প্রচার চালাচ্ছে (অবৈজ্ঞানিক প্রচার), তার কারণ কি?

৩) পরিবেশ রক্ষা করার জন্য গাছ লাগানোর কথা বললে অসুবিধা কোথায়? অর্থাৎ এই প্রচারের নেতিবাচক দিক কি?

৪) ব্যাটারি চালিত বাহন চালালে যেহেতু ধোঁয়া নির্গত হয় না, তাই এর প্রচলন হওয়া তো ভালো। বড় বড় শহরে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যানবাহনের জন্য বাতাস দূষিত হয়। সোলার সিস্টেম বা গ্রীন এজার্নির ব্যবহারে সমস্যা কি?

৫) যদি বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মনুষ্য জনিত কারণ নগণ্যই হয় এবং সেটা জানলে মানুষ কি পরিবেশ বিষয়ে বেশি বেপরোয়া হয়ে যাবে না? এই প্রশ্নগুলির জবাব আগামী সংখ্যা দেওয়া হবে।

পুরুলিয়ার মতো উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে একটি লাইব্রেরিতে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে এই বিষয়ে সেমিনার এই পর্যায়ে হয়েছে। সেমিনারগুলিতে মানুষ উৎসাহভাবে অংশ নেন।

'তিলোত্তমা ভয় নাই রাজপথ ছাড়ি নাই'।

WE DEMAND JUSTICE

কবিতা ঃ

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

– তন্ময়

হিরোশিমা নাগাসাকি কেঁপে ওঠে বারবার
বোমার আঘাতে হয় বহু প্রাণ ছারখার,

একটি লিটিল বয় আরেকটি ফ্যাট ম্যান
পরমাণু বোমা রূপে দুটি মহা শয়তান,

মার্কিন শাসকের ঘৃণ্য আগ্রাসন
চারিদিকে কালো ধোঁয়া, ভয়াবহ গর্জন,

ধ্বংসের তান্ডবে রক্তের স্রোত বয়
মৃত মায়ের স্তন মুখে কত শিশু শুয়ে রয়,

সবকিছু পুড়ে চাই জীবনের আঙিনায়
সভ্যতা নিরুপায়, মুখ ঢাকে লজ্জায়,

মৃত্যুর যন্ত্রণা চলে বহু যুগ ধরে
বাতাসে বিষের ফণা এখনো ছোবল মারে,

নিষ্ঠুর ইতিহাস তোলপাড় করে মন
প্রতিবাদে প্রতিরোধে জাগরিত জনগণ,

আমরণ সংগ্রামে আমরা অকুতোভয়
যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবতার হবে জয়।

এই সময়

– সুশোভন মুখার্জি

রাজপথে আজ আছড়ে পড়েছে
ক্ষোভ-আগুন!
শহরে এখন তপ্ত হাওয়ায়
ক্রোধ দ্বিগুণ!
শোকে বিহ্বল মানুষেরা আজ
গাইছে গান
বাংলার আজ প্রতি ঘরে ঘরে
জেগেছে প্রাণ।
আমাদের মেয়ে খুন হল কেন
জবাই চাই।
প্রতিটি রক্ত ফোঁটার হিসাবে
পাল্টা মার।
প্রস্তুত তাই ক্রুদ্ধ জনতা, রাজপথ আজ
দখলে তার।

সারাটা বাংলা রাত জেগে আছে
মিছিলে মিছিলে কাটছে দিন,
মেয়ে হারানোর যন্ত্রণা বুকে
বিক্ষোভ আজ সীমানাহীন।
একটাই শুধু আওয়াজ আজ
বিচার চাই
আমার মেয়ের হত্যাকারীর
বিচার চাই।
সকাল বেলার সূর্যও ওঠে
বুকে লিখে নিয়ে 'বিচার চাই'
অস্তাচলের আকাশেও দেখি
লাল অক্ষরে লেখা হয়ে যায়
সেই কথা –
আমার মেয়ের হত্যাকারী
দানবদের বিচার চাই!
রাতের আকাশে তারারাও যেন গাইছে গান –
অন্ধকারেও জেগে থাকো স্থির
দাবি তুলে ধরা লক্ষ প্রাণ
বিদ্রোহী আজ লক্ষ প্রাণ!

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা Registration No.: SO197407 of 2012-13

১৪ই অগাস্ট মধ্য রাতে যাদবপুরে

২০শে সেপ্টেম্বর, স্বাস্থ্যভবন থেকে সিজিও কমপ্লেক্সের পথে

শিলিগুড়ি, সেমিনার

১৮ই অগাস্ট, বেহালা

বনগাঁ, ক্ষুদিরাম বসুর শহীদ দিবস পালন

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.com